বিচিত্র জীবজন্তু

অজয় হোম



বিচিত্র জীবজন্তু

অজয় হোম

ছোটদের বইয়ের স্বপ্ন রাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কল-৯

প্রকাশক :—
রবীন বল
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৮৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৯৮৯

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

মূল্য : ১৫`

মুদ্রাকর :
মনোরঞ্জন পান
নিউ জয়কালী প্রেস
৮এ, দীনবন্ধু লেন
কলকাতা—৭০০০০৬

উৎসর্গ

যাঁর উৎসাহ এবং সক্রিয় সহযোগিতা
ছাড়া এই নিবন্ধগুলি লেখা সম্ভব হতো না
অনুজপ্রতিম সেই
গৌরকিশোর ঘোষ-এর
করকমলে

কৈফিয়ৎ

পশুপাখি বনজঙ্গলের গল্প সর্বকালের শিশুচিত্তকে নাড়া দেয়। রোমাঞ্চিত সম্ভবত করে বয়স্ক পাঠকদেরও। এই ধারণা দৃঢ়মূল হল 'প্রকৃতি প্রেমিকের চোখে' পর্যায়ে দৈনিক 'আজকাল'-এর কোনো না কোনো সোমবারে এবং "কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান' পত্রিকাতে লিখতে গিয়ে। শৈব্যা প্রকাশন-এর শ্রীরবীন বল-এর আগ্রহে এবং শ্রীজয়ন্ত দত্তর সহযোগিতায় বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারলাম।

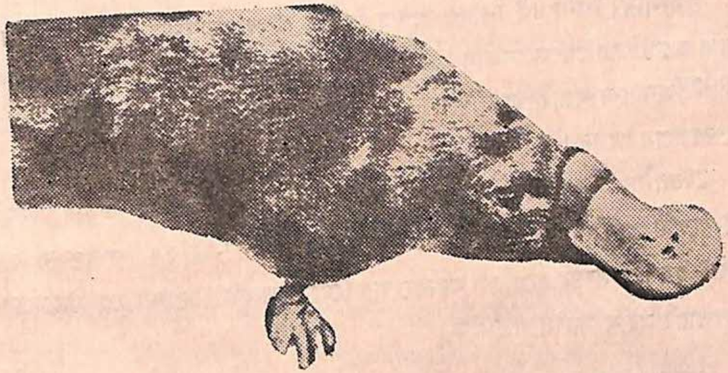
বর্তমান যুগে কলকাতায় নানা অসুবিধের মধ্যে পনের-কুড়ি দিনের ভিতর বই প্রকাশ যে কী দুরূহ তা যাঁরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁরাই বুঝবেন। এর জন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই 'নিউ জয়কালী প্রেস' ছাপাখানার, ব্লক প্রস্তুতকারক 'লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসেস' এবং ফটো প্রিণ্টের জন্য 'ল্যান্সডাউন আর্ট স্টুডিও'র কর্মীবৃন্দদের।

'বিচিত্র জীবজন্তু' কি পৃথিবীতে কম আছে? অসংখ্য। এটি তার প্রস্তুতি পর্ব এখন বইটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হলে তবেই এর সার্থকতা। তখনই ভাবা যাবে আরও কিছু জীবজন্তুকে লোকচক্ষে আনবার।

অজয় হোম

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

সূচী



হংসচঞ্চু

পৃথিবীতে কত সবই না অদ্ভুত জীবজন্তু আছে। তাদের পরিচয় পেলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়! এখনও এরা পৃথিবীর বুকে টিকে আছে। এইরকম ছটি বর্গের প্রাণী এখনও অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে একটি বর্গের প্রাণী হচ্ছে সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ীতে উত্তরণের প্রথম পদক্ষেপ। তাদের একটি প্রজাতির নাম— হংসচঞ্চু (অর্নিথরহাইঙ্কাস আনাটিনাস), ইংরেজি— ডাকবিল, প্লাটিপাস।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের বর্গ (অর্ডার) হল ডিম্বপ্রসবকারী (মনোট্রেমাটা)। অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের মতো গায়ে লোম ও রক্তে উষ্ণতা থাকলেও এরা ডিম পাড়ে এবং তা' দিয়ে ডিম ফোটাবার পর বাচ্চাদের স্তন্যপান করায়। এদের অপর নাম অন্ডজস্তনী।

অপরাপর প্রাণীদের চেয়ে এদের রক্তের উষ্ণতা কিন্তু বেশ মৃদু। পাখিদের মতো ডিম পাড়া এবং আরও দু-একটি ধাঁধাঁ লাগানো সাদৃশ্য দেখে আগে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে এদের পক্ষিকুলের সঙ্গে একটা নিকট সম্পর্ক আছে।

কিন্তু তা সত্য নয়, অন্যান্যদের মতো সোজাসুজি সরীসৃপকুল থেকেই এদের উদ্ভব।

স্তন্যপায়ী কিনা এই নিয়েও সন্দেহ ছিল। ইংলণ্ডে যখন এর গুটি কয়েক প্রথম অস্ট্রেলিয়া থেকে চালান যায়, তখন বিজ্ঞানীরা মহা ফাঁপরে পড়েন। 1802 খ্রিস্টাব্দে শারীরস্থান বিশারদ এভারার্ড হোম অঙ্গব্যবচ্ছেদ করে সকল সন্দেহভঞ্জন করেন।

বৈজ্ঞানিক নাম 'মনোট্রেম' কথার অর্থ 'একটি পথ'। এই একটি পথেই এই বর্গের প্রাণীরা মলমূত্র ত্যাগ, প্রজনন এবং স্ত্রী-জাতির ডিম্বপ্রসব সব কাজই হয়। উদ্ভব হয়েছিল মধ্যকল্পের (মেসোজোইক) রক্তাশ্মযুগে (ট্রায়াসিক) স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ থেকে।

হংসচঞ্চুর দেহ গোলাকার, লম্বায় প্রায় 61 সেমি, তার মধ্যে চ্যাপটা লোমশ লেজ প্রায় 15 সেমি। ওজনে প্রায় 2 কেজি পর্যন্ত হয়। পা বেঁটে, আঙুল 5টি তীক্ষ্ন নখরযুক্ত। সামনের পায়ে নখের মাঝে হাঁসের মতো ঝিল্লী দিয়ে জোড়া। সেই ঝিল্লী নখ ছাড়িয়ে, সাঁতার কাটার সময় তার প্রয়োজন। পিছনের পায়ে ঝিল্লী নেই। ঠোঁট হাঁসের মতো দেখতে বটে, তবে পাখির চঞ্চুর মতো শিং-এর উপাদানে গঠিত নয়। কোনো স্তন্যপায়ীর নাক ও ঠোঁট টেনে চ্যাপটা ও লম্বা করলে যেমন হয় তেমনি নরম চামড়ার, দেখায় যেন রবারের। দেখলে মনে হয় অন্য কোনও প্রাণীর এই অদ্ভুত চঞ্চু বা ঠোঁট এনে অস্ত্রোপচার করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ওই ঠোঁট অসংখ্য সূক্ষ্ম অনুভবসম্পন্ন স্নায়ুতে ভর্তি। জলের তলায় বন্ধ চোখে খাদ্য খোঁজার সময় ওই ঠোঁটের সামান্যতম স্পর্শ দিয়েই খাদ্যকে অনুভব করতে পারে। উপরের ঠোঁট বেগুনি-কালো, নিচের ঠোঁটে হলদে ও কালোর ছোপ। অন্যান্য পশুদের মতো কান বাইরে বের করা নয়, পাখিদের মতো মাথার দুপাশে লোমের ভিতর ছোটো ছাঁদা। চোখ খুব ছোটো। জলের ভিতর যখন চলে বা সাঁতার দেয়, তখন চোখ ও কানের উপর পর্দা পড়ে ঢেকে যায়। গায়ের লোম মোটা, নরম ও পশমী। পিঠের রঙ গাঢ় বাদামী, পিছনের দুপায়ে লড়াইয়ে মোরগের নখের মতো ফাঁপা শিং আছে যা বিষগ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত। কেবল আত্মরক্ষার্থে এর ব্যবহার হয়। এই বিষে মানুষ মরে না,—কিন্তু একটা কুকুর মারা যেতে পারে। স্ত্রী-জাতির এই নখ ও বিষগ্রন্থি থাকে না। শিশুকালে হংসচঞ্চুর

উপরের চোয়ালে দু'জোড়া দাঁত থাকে। পরে বড়ো হলে এই দাঁত শক্ত শিং-এর মতো রূপ নেয়।

বাসস্থান—পূর্ব ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া এবং টাসমানিয়ার ছোটবড়ো নদীতে। বেশিরভাগ সময় জলে থাকলেও একনাগাড়ে এক থেকে পাঁচ মিনিটের বেশি জলে ডুবে থাকতে পারে না। আগে এদের 'জল-ছুঁচো' বলা হতো।

খাদ্য—জলজ পোকামাকড় ও অন্যান্য ছোট মেরুদণ্ডহীন প্রাণী। যেমন, শামুক, কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি। খায় প্রচুর, দেহের ওজনের অনুপাতেই দৈনিক আহার।

স্বভাব—জলের তলায় খাদ্য সংগ্রহ ক'রে ডাঙায় উঠে এসে গলাধঃকরণ করেই আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সবচেয়ে সক্রিয় হয় প্রত্যুষে এবং সন্ধ্যায়। তখন দেখা যায় নিঃশব্দে জলে ডুব দিয়ে সাঁতার কাটতে। জলের উপর হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে খানিক ভেসে চলে আবার ডুব দেয়। শীতকালে অল্প কয়েক-দিনের জন্যে শীতঘুমও দেয়।

হংসচঞ্চুরা নিশাচর। নদীর পাড়ে গর্ত খুঁড়ে বাস করে। তবে গর্তের মুখ জলের ধারে এবং জল থেকে একটু উঁচুতে। কখনওবা গর্তের মুখ জলের ভিতর তাও দেখা যায়। এদের স্বভাব সদাই অস্থির এবং প্রাণচঞ্চল। এক মুহূর্ত স্থির থাকে না।

প্রজননকাল আগস্ট থেকে নভেম্বর। জলেই মিলন সংঘটিত হয়। প্রাকমিলনের দৌড়ঝাঁপ নানা কায়দায় হয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে পুরুষ স্ত্রীর লেজটিকে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে ওই অবস্থায় দুজনে ঘুরে ঘুরে সাঁতার কাটে।

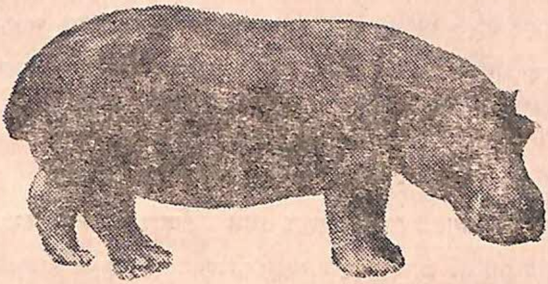
বাসস্থানের গর্ত উপরের জমি থেকে 30 সেমি নিচের মধ্যে থাকে, কিন্তু লম্বায় দেখা গেছে 18 মি পর্যন্ত। এই লম্বা গর্তের মধ্যে থাকে অনেক শাখাপ্রশাখা। একটি শাখা যা সবচেয়ে বেশি আঁকাবাঁকা তার শেষে প্রসূতি-আগার। এই কক্ষটিতে ঘাস ও ইউকালিপটাসের পাতা বিছানো। ডিম পাড়তে যাবার সময় লেজ দিয়ে মাটি নাড়িয়ে পথ বন্ধ করতে করতে তার প্রসূতি-আগারের দিকে যায়। গর্ভধারণের সময় 15 দিন। ডিম পাড়ে সাধারণত 2টি, কখনও 1টি, ক্বচিৎ 3টি। ডিম অনেকটা চড়াইপাখির ডিমের মতো, লম্বায় 16 থেকে 18 মিমি, চওড়ায় 14 থেকে 15 মিমি। সাপের ডিমের মতো

নরম চামড়ার, দোমড়ানো যায় এবং রঙ সাদাটে। তলপেটের নিচে ডিম রেখে তা দিয়ে ৯ থেকে 10 দিনেই বাচ্চা ফোটায়। সদ্যপ্রসূতের গায়ে লোম থাকে না, চোখ বন্ধ। মা-হংসচঞ্চুর পেটের উপর খুব ছোটো ছোটো ছাঁদা দিয়ে (বোঁটা নেই) দুধ ক্ষরণ হয়, সেই দুধ বাচ্চা চেটে খায়। 11 সপ্তাহে চোখ ফোটে। 4 মাস পূর্ণ হলে মা বাচ্চাকে জলে নামায়।

হংসচঞ্চুরা 10 থেকে 15 বছর বাঁচে। শরীরের উত্তাপ মোটামুটি 32·2° সে। ক্বচিৎ গলা দিয়ে মৃদু গোঙানির মতো আওয়াজ বার করে। বয়স্ক পুরুষের গায়ে প্রায় শেয়ালের গায়ের বোঁটকা গন্ধের মতো। ঘাড়ের শেষপ্রান্তে অবস্থিত গ্রন্থি থেকে এই গন্ধ বার হয়।

বীবরের মতো নরম পশমী লোম ও চামড়ার জন্যে এদের আগে খুবই হত্যা করা হতো। তার ফলে এই অদ্ভুত স্তন্যপায়ীটির প্রায় লুপ্ত হবার দশা ঘটে। বর্তমানে আইন করে এদের রক্ষা করার বন্দোবস্ত হয়েছে।





জলহস্তী

আফ্রিকায় আমি কখনও যাই নি। সকলের মতো আমিও আলিপুরের পশুশালায় দেখেছি কোন ছেলেবেলা থেকে। তখন থেকেই এই কদাকার বিশালদেহী জীবটি আমায় বেশ আকৃষ্ট করত। বিরাট হাঁ, কিন্তু জিভ নেই। কুমিরেরও নেই। বাংলায় এদের বলি—জলহস্তী (হিপোপটেমাস আমফিবিয়াস), ইং. হিপ্পোপট্যাম্যাস। বৈজ্ঞানিক নামের অর্থ 'হিপপো' ঘোড়া, 'পটামাস' নদী। নদীর ঘোড়া। কিন্তু হাতির মতো মোটাসোটা বলে আমরা জলের হাতি বা জলহস্তী বলি।

জলহস্তী যুগ্ম-খুর বর্গে (আর্টিওডাকটাইলা) দুটি গণে বিভক্ত। একটি বড়ো (হিপপোপটেমাস) আর একটি বামন (পেএরপসিস)।

বাসস্থান—বড়োটি যেটিকে আমরা আলিপুরের পশুশালায় দেখতে পাই সেটি আফ্রিকার নদীর বাসিন্দা। অপরটি বামন (পিগমী) প্রজাতির যা একসময় আলিপুরের পশুশালাতেও ছিল, তারাও আফ্রিকার আইভরি কোস্ট, লাইবেরিয়া ও সিয়েরা লিয়নের কাছাকাছি বাদার ঘন জঙ্গলের বাসিন্দা। দেহ-মাথা সহ লম্বায় 1·5-1·75 মি, লেজ 156 মিমি, ঘাড়ের কাছ পর্যন্ত উচ্চতা 1·5-1·75 মি, ওজনে 160-240 কেজি।

বড় জলহস্তীর একটিমাত্র প্রজাতি যা একসময় আফ্রিকার সমস্ত নদী ও স্রোতস্বতী যেখানে জল খুব গভীর সেখানে তাদের আস্তানা ছিল। বর্তমানে মানুষের হাতে ধ্বংস হওয়ার ফলে এখন খার্তুমের উত্তর থেকে পশ্চিমে সিয়েরা লিয়নের মধ্যে নদীবহুল 17° ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের দক্ষিণে সীমাবদ্ধ।

দেহ-মাথা সহ লম্বায় 3·75 থেকে 4·5 মি, লেজ 560 মিমি, কাঁধের কাছ পর্যন্ত উচ্চতায় প্রায় 1·5 মি, ওজনে 3 থেকে সাড়ে 4 মেট্রিক টন পর্যন্ত হয়। দেহের উপর সরু ছোটো লোম ইতস্তত এমন বিক্ষিপ্ত যে মনে হয় গায়ে যেন কোনো লোম নেই। সাধারণত উপরের চামড়ার রঙ ফিকে তামাটে-পার্টিকলের আভা থেকে গাঢ় পাটকিলে, নিচে বেগুনির আভা। উপরের শ্বদন্ত ছোটো, ব্যাসে কমবেশি 230 মিমি কিন্তু নিচের শ্বদন্ত বড়ো, লম্বায় প্রায় 0·6 মি এবং ওজনে প্রায় 3 কেজি। চামড়া লালা গ্রন্থিতে ভরা। সেখান থেকে ঘামের মতো লাল তন্তুরঞ্জক বার হয়। আলো পড়ে লাল রঙটা ফুটে ওঠে। লোকের বিশ্বাস জলহস্তীর ঘামবিন্দুর মতো দেহ থেকে 'রক্তঘাম' বার হয়।

খাদ্য—ঘাসই প্রধান খাদ্য। সময়ে সময়ে চষা খেতের ভিতর ঢুকে ফসল যতটা না খায় তার চেয়ে গোদা গোদা পা দিয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে বেশি।

স্বভাব—জলহস্তী ভালো সাঁতারু ও ডুবুরি। সাধারণত দিনের বেলায় জলেতেই বা জলের কাছাকাছি থাকে। রাত হলে জল থেকে উঠে ডাঙায় আসে। দেখা গেছে খাবারের খোঁজে জল থেকে উঠে 33 কিমি পর্যন্ত যেতে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ে 0·3 কিমি মধ্যেই থাকে। খাদ্যান্বেষণে এক জায়গায় বেশিদিন কাটায় না, কয়েকদিন বাদে বাদেই অন্যত্র সরে যায়।

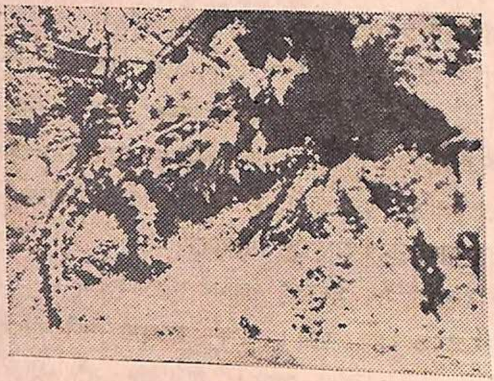
জলের তলায় যখন জলহস্তী ডোবে তখন লম্বালম্বি চেরা নাকের গর্ত ও কান আপনা থেকেই বুজে যায়। প্রয়োজনে ডোবা অবস্থা থেকে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না করে দেখতে ও নিশ্বাস নিতে শুধু চোখ আর নাক জলের উপরে তোলে। জলের তলায় সম্পূর্ণ শরীরটাকে ডুবিয়ে রাখে 3-4 মিনিট। চিড়িয়াখানায় ঘড়ি ধরে দেখতাম কতক্ষণ থাকতে পারে। একবার দেখেছিলাম 28 মিনিট। সুতরাং পুরো আধঘণ্টা থাকাটাও আশ্চর্যের নয়। ভারী দেহের জন্য গুরুত্ব খুব বেশি হওয়ায় জলের তলায় স্বচ্ছন্দে হেঁটে বিচরণ করে। এমনিতে খুবই শান্তশিষ্ট, মোটেই বদমেজাজী নয়, কিন্তু যদি মনে

করে কোনো ছোটো নৌকা বা কোনো অচেনা বস্তু তাদের ক্ষতি করতে পারে তাহলে আক্রমণ করতে পিছপা হয় না।

সাধারণত বয়স্ক পুরুষ একাকী বিচরণ করে, কখনও বা জোড়ায়, সময়ে সময়ে 6-7 জনে, আবার কুড়ি-ত্রিশের দলেও দেখা যায়। নোনা বা মিষ্টি দু-ধরনের জলেই বাস করতে পারে। সারাদিনই হয় জলে বা জলের ধারে ডাঙায় ঘুমিয়ে না হয় বিশ্রাম করে কাটায়। কোনো কারণে বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটলে জলজ ঘাস বা নলখাগড়ার আড়ালে আশ্রয় নেয়।

জলহস্তী বছরের সব সময়েই প্রজনন করতে সক্ষম। 7 বছর বয়স হলে স্ত্রী-জাতি যৌনক্ষমতা লাভ করে। বন্দী অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষ দুজনকেই 3 বছরে ক্ষমতা লাভ করতে দেখা গেছে। পুরুষের যৌনক্ষমতা উত্তুঙ্গে উঠে থাকে 3 দিন, যৌনসঙ্গমে সময় নেয় প্রায় একঘণ্টা। 227 থেকে 240 দিন গর্ভধারণ করে একটি, ক্বচিৎ দুটি সন্তানের জন্ম দেয় জলের তলায় এবং সেখানেই স্তন্যপান করায়। 12 থেকে 16 দিন পার হলেই যৌনসক্ষম হয়। জন্ম সময়ে সন্তানের ওজন হয় 27 থেকে 45 কেজি। বন্দী অবস্থায় 40-50 বছর বাঁচে।

দেহে চর্বি থাকে প্রায় 90 কেজি। মাংস ও চামড়ার জন্যে স্থানীয় অধিবাসীরা শিকার করে করে অবলুপ্তির পথে ঠেলে দিচ্ছে। চামড়া দিয়ে নাকি ভাল সুরুয়া হয়। দাঁত খুব উচ্চদরের গজদন্ত বা আইভরি।



পাহাড়ী শয়তান

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহর থেকে এক বন্ধুর দুটি ছবিসহ চিঠি কদিন আগে (13-8-83) পেয়েছি। মাস দেড়েক আগে সে পার্থ থেকে ইয়র্ক বলে মরুভূমির ধারে একটা জায়গায় গিয়েছিল। সেখানে সে এক বালির খোঁদলের মধ্যে অদ্ভুত এক গিরগিটির দেখা পায়। বালির রঙের সঙ্গে সেটা একদম মিশিয়ে ছিল। সমস্ত গা তার ডুমো ডুমো গুটিকায় ভরা। প্রতিটি গুটিকার উপর একটি করে ক্যাকটাসের কাঁটার মতো কাঁটা। দেখতে খুবই বীভৎস যদিও খুব বড়োসড় নয়, আমাদের ঘরের টিকটিকির চেয়ে কিছুটা বড়ো। চওড়ায় ডবলেরও বেশি। হাত পা বেশ বড়ো। লেজ খুব বড়ো নয়। তবে গুটিকা ও কাঁটা সর্বত্র। ছবি তোলার পর শাটারের আওয়াজ বা তার উপস্থিতি বুঝতে পেরে সেই বীভৎস গিরগিটটা আস্তে আস্তে তার দিকে ফিরে পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে। "তার ঐ রূপ দেখে আমার শরীরে শিহরণ খেলে গেল। নিশ্চয়ই বিষাক্ত। কি জানি হয়তো আফ্রিকার বিষাক্ত থুতু ছেটানো সাপের মতো থুতু ছিটোবে, না হয় লাফিয়ে গায়ে পড়ে কামড়ে দেবে। আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে পিছন ফিরে পড়িমরি করে দৌড় দিলাম। বালির মধ্যে দৌড়নও খুব শক্ত। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছি সেই বীভৎস জীবটি তেড়ে আসছে কি না। না, সে আসে নি। নিরাপদ স্থানে পৌঁছে হাঁফাতে লাগলাম।

"এর কদিন বাদে এক সকালে পার্থের রাস্তাতে দেখি এক আদিবাসী খুব সন্তর্পণে গা বাঁচিয়ে একটা ডাণ্ডার ডগায় সরু তার দিয়ে পেটে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গোটা দুই। এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করলাম, ওগুলো কি? জবাব পেলাম, **Devil, Mountain Devil**। আমি ঝুলন্ত অবস্থায় ওর মুখের ছবি নিলাম। তুমি কি বলতে পার এই বীভৎস জীবটির পরিচয়?" আমি যতটুকু জানি তা লিখে তাকে জানিয়েছি।

1843 খ্রিস্টাব্দে নামকরা আবিষ্কারার্থে ভ্রমণকারী ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডভোকেট জেনারেল জর্জ ফ্লেচার মুর ইয়র্ক জেলায় এই অদ্ভুত প্রাণীটিকে প্রথম দেখেন। তিনি লিখেছেন, দেখতে ভয়ংকর কিন্তু আসলে সরীসৃপদের মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ ও ছলাকলাহীন প্রাণী। মাথা পিঠ ও লেজে গুটিকার উপর কাঁটা। তাসত্বেও একে ধরে হাতে নিলে কোনোভাবেই আত্মরক্ষার্থে আক্রমণ করার চেষ্টা করে না। খুব জ্বল জ্বলে চোখ কিন্তু খুব ছোটো। মুখও খুব ছোটো। চলাফেরা খুবই বেঢপ। স্থানীয় লোকেরা একে 'শয়তান' বলে। ইয়র্ক ছাড়া অন্য জায়গাতেও যখন দেখা গেল, বিশেষত পাহাড়ের উপর, তখন এর নাম হল 'পাহাড়ী শয়তান'।

জর্জ মুরের এই বর্ণনার পর একশ পঁচিশ বছরের উপর পার হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে ওদের নিয়ে অনেক অসম্ভব কাহিনীও গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে একটি, মুহূর্তের মধ্যে এরা নাকি গায়ের রঙ জায়গা অনুযায়ী বদলে নিতে পারে। কিন্তু জীববিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেছেন, এরা মুহূর্ত মধ্যে রঙ বদলায় না, রঙ বদলাতে বেশ কয়েক মিনিট সময় নেয়, খুব ধীরে ধীরে রঙ বদলায়। প্রধানত রঙের বদল হয় উজ্জ্বল কমলা থেকে লালচে পাটকিলে, হলদে থেকে ময়লাটে ধূসর। এই অনুকৃতি শত্রুর চোখে ধুলো দেবার এক অপূর্ব কৌশল।

বিজ্ঞানীরা পাহাড়ী শয়তান নামে সন্তুষ্ট হলেন না। নাম দিলেন, **Moloch horridus**। মলোক হল প্রাচীন অগ্নিদেব। এর উল্লেখ আছে বাইবেলে (**1 King. XI. 7**)। সেখানে বলা হয়েছে এই অগ্নিদেব আমমোনাইটদের দেবতা। এই আমমোনাইটরা দাবি করতেন তাঁরা লোট-এর বংশোদ্ভুত বলে (**Gen. XIV. 38**)। এই দেবতার কাছে শিশুদের বলি দেওয়া হতো। 'মলোক' মানে আবার রাজা। লাতিন 'হরিডাস' মানে কাঁটাযুক্ত। এই নিরীহ ছোট সরীসৃপ লম্বায় মাত্র 20 সেমি।

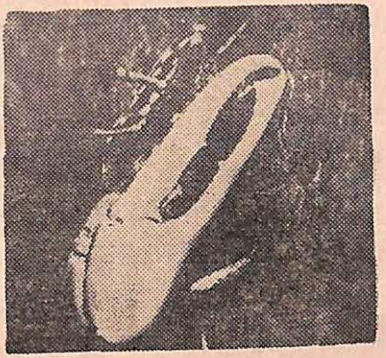
এদের খাদ্যগ্রহণ খুবই আকর্ষণীয়। যেখানে কালো পিঁপড়ের দল লাইন বেঁধে চলে তার পাশে খুব ধীরে সুস্থে এসে দাঁড়ায়। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। তারপর মাথা নিচু করে কাজ শুরু করে দেয়। নির্ভুলভাবে জিভটা বের ক'রে বর্শা ছোঁড়ার মতো বিদ্যুৎগতিতে একটি একটি ক'রে পিঁপড়ে ধরে মুখের মধ্যে চালান ক'রে দেয়। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে পাওয়া যায় প্রত্যেকবার খাদ্য-গ্রহণের সময় একটি করে 1000 থেকে 5000 পিঁপড়ে খায়। অসম্ভব এদের অধ্যবসায়।

অনেকে বলেন এরা ত্বক দিয়ে জলপান করে। সেটা প্রমাণিত হয় নি এবং অসম্ভব বলে মনে হয়। অবশ্য ফোঁটা ফোঁটা জল এদের গায়ের উপর ফেললে মুহূর্ত মধ্যে শুষে নেয়। বন্দী প্রাণীদের জলের পাত্রে ছেড়ে দিলে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে থাকে। কিন্তু এই আচরণ অনেক সরীসৃপের মধ্যেই দেখা যায়। সম্ভবত দেহের মধ্যে এবড়োখেবড়ো যে গর্ত আছে তার মধ্যে দিয়েই জল শরীরে প্রবেশ করে, ত্বক দিয়ে নয়। সরীসৃপরা উভচরদের মতো ত্বক দিয়ে জল-গ্রহণ বহু পূর্বেই ছেড়েছে। সেজন্য শুকনো খরা জমিতে থাকতে অসুবিধে বোধ করে না। দেহের শক্ত চামড়ার আবরণ এদের শুষ্কতা থেকে রক্ষা করে।

পাহাড়ী শয়তানদের বন্দী হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডিম পাড়তে দেখা গেছে। খুব সম্ভব যারা ধরা পড়ে তারা স্ত্রী-জাতি, কারণ তারা ডিম পাড়ার জন্যে বাসা বা জায়গা খোঁজার সময় লোকের চোখে পড়ে। ডিম উপবৃত্তাকার। লম্বায় 3 সেমি, চওড়ায় 2 সেমি। 10টা পর্যন্ত ডিম পাড়ার খবর পাওয়া যায়। ডিম ফোটে প্রায় 8 সপ্তাহে।

আদিবাসীরা এদের খুব ভয় পায়। নিরীহ জেনেও স্পর্শ করে না। মনে হয় সংস্কারবশতই। কিন্তু সন্তর্পণে তারে ঝুলিয়ে বিক্রির জন্যে আনে। বর্তমান অস্ট্রেলিয়া সরকার এই নিরীহ ছোটো রঙিন সরীসৃপকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে।





বেউলে কাঁকড়া

সুন্দরবনের সন্দেশখালি দ্বীপে আছি। সকালে দ্বীপটাকে পরিক্রমা করতে ও পাখি দেখতে বেরিয়েছি। ঘুরতে ঘুরতে বড় কলাগাছিয়া নদীর পাড়ে এসেছি। পাড়ের ধারে জল ঘেঁষে বানি বা বাইন গাছের সারি। তারই তলায় ভিজে মাটিতে যেন ফুটে আছে হাজার হাজার লালচে কমলা রঙের ফুল। এখন ভাটা। জল নেমে গেছে। ফুলগুলো ঘোরাফেরা করছে দেখে কাছে গিয়ে দেখলাম ফুল নয় কাঁকড়া। আকারে খুবই ছোটো। শুধু একটা দাঁড়া যেন ডান দিকে এবং যার রং লালচে-কমলা।

আমরা স্থির হয়ে দাঁড়াতে গর্ত থেকে বের হয়ে বা গর্তে শরীরটাকে রেখে শুধু বড়ো দাঁড়াটাকে দোলাচ্ছে কখনও বেহালার ছড় টানার মতন, কখনওবা রাউন্ড আর্ম ক্রিকেট বল করার মতো। একবার মনে হল বর্ষার দিনে কোনো লোক ট্যাক্সি থামানোর জন্য হাতের ছাতাটাকে যেভাবে শূন্যে তুলে ইসারা করে, এদিকে ট্যাক্সি ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যায়, দাঁড়াটা যেন সেইভাবে আন্দোলিত করল।

কাদার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে গোটা কতককে তুলে দেখলাম। আরেকটা দাঁড়া

আছে বাঁ দিকে, সেটা খুবই ছোটো। দু-একটার দেখলাম দুটো দাঁড়াই ছোটো। রঙচঙে নয়। বুঝলাম এগুলো স্ত্রী-কাঁকড়া। পুরুষের বড়ো দাঁড়ার উপরের অংশ সাদা থেকে লালচে-কমলা, তলার অংশে কোনো জায়গাতেই সাদার ভাব নেই সবটাই লালচে-কমলা। দেহের ওজনের তুলনায় দাঁড়াটা ভারি। দাঁড়ার দুটো অংশেই করাতের মতো খাঁজকাটা। তার ফাঁকে আঙুল দেবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কামড়ে ধরল না। মানুষ যেমন বেঁয়ো বা ল্যাটা হয়, এদের বড়ো দাঁড়া ডাইনের জায়গায় বাঁয়ে হয় কিনা জানি না। মনে হয় হওয়া সম্ভব।

ওদের কলোনির কাছে ছোটো গোল কাদার বল রাশি রাশি। বড়ো দাঁড়া কোনো কাজের নয়, ছোটো দাঁড়া দিয়ে কাদা চেপে রস বা তাদের উপযোগী কোনো খাদ্য থাকলে খায়, তারপর বলের মতো করে ফেলে দেয়।

পুরুষের বড়ো দাঁড়ার কাজ হল সেটাকে আন্দোলিত করে বিপদসূচক সঙ্কেত জানানোর আর স্ত্রী-জাতিকে আকর্ষণ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করায়। স্ত্রী-জাতি সবসময় যে রঙিন হাতছানিতে ভোলে বা সাড়া দেয় এমন মনে হয় না। না হলে জীবনের ছন্দই বৃথা।

কলকাতায় ফিরে বই-পত্তর ঘেঁটে বিশেষ কিছুই পেলাম না। জানলাম বেউলে বা একদাঁড়া কাঁকড়া, ইং· ফিডলার ক্র্যাব একটি মাত্র গণ 'ইউকা'র মধ্যে আবদ্ধ। এদের বহু প্রজাতি। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সমুদ্রের ধারে বা কাছাকাছি যেখানে গরান ও বাইনের ধার ঘেঁষে নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে বা গরানের জলায় কাদা এবং বালির মধ্যে এদের বসবাস।

মালয় বোর্নিও ইত্যাদি অঞ্চলে প্রায় আটদশ রকমের প্রজাতি দেখা যায়। তার মধ্যে প্রধান 'ইউকা অ্যানুলিপেস'। এদের দেহ নীল বা পাটকিলে, তার তার উপর সাদা ছিট নেই, বড়ো দাঁড়াটা ফিকে গোলাপী। দ্বিতীয়, 'ইউকা ডাম-স্নিয়েরি'র দেহ জ্বলজ্বলে নীল। দূর থেকে যেন মাটিতে শত শত নীলা ছড়িয়ে আছে মনে হয়।

জোয়ার এলে গর্তের মুখ ঢেকে এরা কাদার তলায় ঢুকে যায়। জল সরে গেলে আবার বার হয়। সুন্দরবনে যাদের দেখেছি সেই বেউলে বা একদাঁড়ার বৈজ্ঞানিক নাম 'ইউকা মারিওনিস'। 'অ্যানুলেপিস'-দের ভয়ে বা কোনো উত্তেজনায় পিঠের খোলার রং সাদাটে মেরে যায়। আমাদের বেউলে কাঁকড়ার কোনো পরিবর্তন হয় কিনা তা লক্ষ্য করি নি।



ক্যাঙ্গারু

খড়িযুগের (ক্রিটেশ্যাস) শেষভাগে আনুমানিক 6 কোটি বছর আগে আকাশছোঁয়া ঘন গাছের নিচে স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঝোপঝাড়ের তলায়, কিংবা পাথরের খোঁদলে, হয়তোবা শুকনো মরুভূমি অঞ্চলে যেখানে বিশাল বিশাল ভীমসরট বা ডাইনোসরদের আড়ালে একদল ছোট্ট লোমশ জন্তু দখা যেত, যাদের রক্তে উষ্ণস্রোত সবে বইতে শুরু করেছে। সেই জন্তুরা ডিম না পেড়ে জ্যান্ত শাবকের জন্ম দেয়, তারা বুকের দুধ খাইয়ে তাদের বাচ্চাদের মানুষ করে। আমরা তাদেরই কয়েকটা জীবাশ্ম পেয়ে জেনেছি, যে জন্তুদের আমরা স্তন্যপায়ী বলি, তারাই তখন পৃথিবীর বুকে প্রথম এসেছে। অত কোটি বছর আগে এই ছোটো ছোটো জন্তুরা একটি জাতি বা বংশের হয় নি, বিভিন্ন জাতের হয়েছিল। আশ্চর্য হই শুধু বংশগত ঐতিহ্য বজায় রাখা দেখে নয়, যখন দেখি প্রাকৃতিক সমস্ত অদলবদল ও অবস্থা পরিবর্তনের ভিতরেও বেঁচে থাকার তাগিদে আজও লড়াই করে টিকে আছে। উপরের ছবিটি তারই একটি জীবন্ত নিদর্শন।

অঙ্কগর্ভ বর্গের (মারসুপিয়ালিয়া) অন্তর্গত ধানিকুরঙ্গ বংশের (ম্যাক্রপোডিদি) এক প্রজাতি, নাম— ক্যাঙ্গারু (ম্যাক্রপাস জাইগানাটিয়াস, ম্যা. মেজর), ইং. গ্রেট গ্রে ক্যাঙ্গারু, ফরেস্টার। আরও দুটি প্রজাতি আছে। যেমন, প্রায়

সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার সমতলভূমির 'লাল ক্যাঙ্গারু' (ম্যা· রুফাস) এবং অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রকূলবর্তী পর্বতমালা ও অভ্যন্তরীণ পাথুরে পাহাড়ের 'ওয়ালারু' (ম্যা· রোবাসটাস)।

অঙ্কগর্ভ অর্থাৎ তলপেটে একটা চামড়ার পকেট বা থলি যা সামনের দিকে খোলে। তার মধ্যে থাকে কয়েকটি স্তনবৃন্ত। অনেকের কিন্তু এই থলি বিভিন্ন স্থানে থাকে এবং বিভিন্ন আকারে। আবার কারুর একদম নেই। ক্যাঙ্গারুদের যেমন সামনে খোলে অন্যদের প্রায় সকলেরই পিছন দিকে। প্রত্যেক জাতেরই বাচ্চা এত আগে জন্মায় যার ফলে ভ্রূণ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় না। আশ্চর্য হই যখন দেখি প্রসবের পর জননদ্বার থেকে বাচ্চারা অন্ধ অবস্থায় ঠিক পথ চিনে তলপেট আঁকড়ে উঠে এসে থলির মধ্যে ঢুকে বোঁটার সঙ্গে লেগে থাকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। সেইসময় ঐ ভ্রূণের ওজন থাকে এক আউন্স।

বাসস্থান—অঙ্কগর্ভ বর্গের জন্তুদের পুরাকালে পৃথিবীর সর্বত্রই পাওয়া যেত। বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও তার উত্তরের কয়েকটি দ্বীপের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ। এরা নানা জাতের ও নানা আকারের। অস্ট্রেলিয়ার লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ান আড়াই মিটার উঁচু ক্যাঙ্গারু থেকে ব্রাজিলের খুদে ছুঁচো-অপোসম (মনোডেলফিস) যারা গোল 50 পয়সারও কম ওজনের। অস্ট্রেলিয়ায় অনেক অঙ্কগর্ভ আছে যাদের সাদৃশ্য পাওয়া যায় নেকড়ে, বিড়াল, কাঠবিড়ালী, ভোঁদড়, ধেড়ে-ইঁদুর, নেংটি, খরগোস ইত্যাদির মধ্যে।

ভৌগোলিক সংস্থানের জন্য অন্য কোনও জন্তু অস্ট্রেলিয়ার ভিতর ঢুকতে পারে নি, একমাত্র অঙ্কগর্ভরাই রাজত্ব করে গেছে। কিন্তু আমেরিকায় অন্যান্য বর্গের জন্তুদের মধ্যে থেকেও অঙ্কগর্ভের নিজেদের বংশধারাকে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে আজ পর্যন্ত এভাবে জিইয়ে রাখাটা খুবই কষ্টের পরিচয় এবং আশ্চর্যেরও বটে।

ক্যাঙ্গারু জীবিত অঙ্কগর্ভদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। মাথা ও দেহ নিয়ে লম্বায় 800 থেকে 1600 মিমি, মোটা থেকে সরু লেজ 700—1100 মিমি এবং ওজনে 23 থেকে 70 কিলো। যতদিন বাঁচে অর্থাৎ 15-20 বছর এরা লম্বায় ও ওজনে বাড়তেই থাকে, গড়ের তুলনায় অনেক সময় তা ছাড়িয়েও যায়। গায়ের লোম মোটা ও খসখসে। গায়ের রঙ ধূসর, লাল, পাটকিলে এবং কালচে

ভাবের। লাল ক্যাঙ্গারুরা সাধারণত লালচে কিন্তু স্ত্রী-জাতির রঙ নীলচে-ধূসর।

পিছনের অংশ অস্বাভাবিকভাবে বড়ো এবং শক্তিশালী মাংসপেশী সমৃদ্ধ। লেজ দিয়ে যেমন ভারসাম্য বজায় রাখে তেমনি সেটা ব্যবহার করে লাফানোর সময় হালরূপে এবং বসবার তৃতীয় পা হিসেবে।

ক্যাঙ্গারুরা যখন আস্তে আস্তে লাফিয়ে চলে তখন তারা লাফায় 1·2 থেকে 1·9 মি। গতি বাড়লে লাফানর দূরত্ব বাড়ে 9 কিংবা আরও বেশি মিটার। উন্মুক্ত প্রান্তরে তাড়া খেয়ে, নথিভুক্ত আছে, একবার একটা বড়ো ক্যাঙ্গারু প্রায় 13·5 মিটার লাফিয়েছিল। সাধারণত লাফটা উচ্চতায় দেড় মিটারের মধ্যেই থাকে। অল্প দূরত্বে দৌড়ের গতি প্রায় ঘণ্টায় 48 কিমি।

খাদ্য—ঘাস এবং গাছ-গাছড়ার পাতা অর্থাৎ তৃণভোজী। তিন প্রজাতিই খাদ্যসংগ্রহ করে রাত্রে এবং দিনে সূর্যের তাপ যখন বাড়ে তখন বিশ্রাম নেয়।

স্বভাব—বেশ বড়ো দলে দলপতির অধীনে চরে। লালেদের দেখা যায় একসঙ্গে শতাধিক। এই সময় দলপতির সঙ্গে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা হলে তুমুল লড়াই হয়ে ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ হয়।

প্রতি বছর শীতকালে 30-40 দিন গর্ভধারণ করার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সদ্যোজাত অপরিপুষ্ট ভ্রূণরা 14 মাস পকেট থলিতে লালিতপালিত হয়। সেই সময় মাঝে মাঝে বাইরে বেরোয় এবং এদিকওদিক ঘোরে। সামান্যতম বিপদের আভাস পেলে মার অঙ্কগর্ভে এসে লুকোয়। বর্তমানে এদের সংখ্যা কমের দিকে। সাধারণত নিরীহ প্রাণী। ভয় পেলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ায়। খুব অসুবিধেয় পড়লে তবে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।



লজ্জাবতী বানর

না, প্রাকৃতিক পরিবেশে এই জন্তুটিকে কখনও দেখি নি। যেসব গভীর জঙ্গলে ওরা থাকে সেখানে গেলেও সাক্ষাৎলাভ হয় নি এই কারণে যে ওরা নিশাচর। দিনের বেলা গাছের অন্ধকার ফোকরে গোল বলের মতো কুন্ডলী পাকিয়ে ঘুম দেয়। সুতরাং দেখতে পাওয়া খুবই কঠিন, আর রাত্রিবেলা জঙ্গলের মধ্যে গাছের উপর একটি জন্তুকে কপালগুণে ছাড়া দেখা অসম্ভব।

প্রথম দেখেছিলাম দক্ষিণ কলকাতার এক নামকরা মিষ্টির দোকানে। মালিকের চেয়ারের পাশে একটা কাঠের বাক্সের ভিতর বসানো শুকনো ছোটো গাছের একটা ডালের উপর দুপায়ের মাঝে ঘাড়মাথা সব গুঁজে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকত। সন্ধ্যার পর ঐ জন্তুটির জড়তা কেটে যেত, ঘুম যেত টুটে। কাঠের বাক্স থেকে বেরিয়ে আসত। গোটা ঘর জুড়ে চলাফেরা শুরু হতো। চলাফেরাটা ছিল অত্যন্ত ধীর, যেন খুব মেপেজুকে পা ফেলা। মাঝে মাঝে দু'পায়ের উপর সোজা হয়ে হাত দুটো ছড়িয়ে চেটো দুটো খুলে উপর দিকে তুলে মাথা ঝুঁকিয়ে মেঝেতে চলা পোকার দিকে নজর দিত। এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দু'হাতে

পোকা ধরে মুখে পুরতো যে অবাক হতাম। এদিকওদিক পোকামাকড় খেয়ে আস্তে আস্তে উঠে এসে বসত মালিকের কাঁধের উপর। তারপর মুখের তুলনায় ওর ড্যাবডেবে বড়ো গোল চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখত দোকানের খদ্দেরদের।

জন্তুটি শ্রেণ্ঠী বর্গের (প্রাইমেটস্) অন্তর্গত লাজুক বংশের (লরিসিডি) এক প্রজাতি। নাম—লজ্জাবতী বানর, লজ্জর (নাইটিসেবাস কউকাঙ্গ বেঙ্গলেনসিস) ইং. স্লো লরিস, হিন্দি শারমিণ্ডি বিল্লি। মালাগাসির লিমার বা লেমুর জাতীয় শ্রেণ্ঠীর নিকট জ্ঞাতি। অনেকে এদের 'স্লো লিমার'ও বলে থাকেন।

লজ্জাবতী বানর দেহ-মাথা নিয়ে 30-40 সেমি, লেজ না থাকার মধ্যে মাত্র 1·4 সেমি। ওজন আধ থেকে 1·5 কেজির মধ্যে। শক্তসমর্থ চেহারায় গায়ের লোম ছোটো ঘন রোমশ। উপরের দেহের রঙ হালকা বাদামী-ধূসর থেকে গাঢ় লালচে পাটকিলে। তলার রঙ অনেক ফিকে প্রায় সাদা থেকে মলিন হলদেটে বা ধূসরাভ। গোল মাথা, পেঁচার মতো বড়ো গোল জ্বলজ্বলে চোখকে ঘিরে পাটকিলের বৃত্ত। মাথার চাঁদি থেকে পিঠের মাঝখান পর্যন্ত নেমে গেছে পাটকিলের এক পটি। বুড়ো আঙুল অন্যান্য আঙুলের প্রায় সমকোণে, তর্জনীতে শুধু নখর আর বাকি আঙুলের নখ মানুষের মতো চ্যাপ্টা।

বাসস্থান—আসাম, বাংলাদেশ, বর্মা থেকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

খাদ্য—নানারকম ফল, গাছের পাতা, সবরকম পোকামাকড় এবং ছোটো স্তন্যপায়ী জন্তু।

খুব গরম পড়লে এরা গাছের অন্ধকার কোটর থেকে বেরিয়ে এসে বুক পেট গাছের ডালে পেতে হাত-পা ঝুলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকে। সন্ধ্যে হলেই উঠে পড়ে শিকারের সন্ধানে বার হয়।

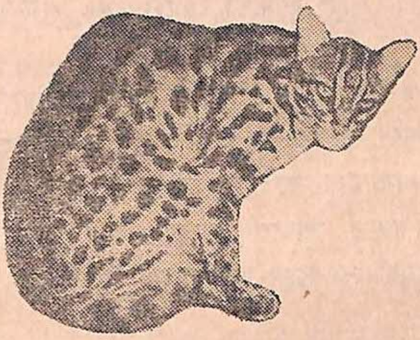
শক্ত করে আঁকড়ে ধরার উপযুক্ত পা দিয়ে গাছের ডাল ধরলে পরে উপর বা নিচের ডাল হাত দিয়ে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে। তখন পা ছেড়ে উপরে বা নিচে যায়। চলাফেরার গতি মন্থর হলেও তার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য থাকে। একটা কীট বা পতঙ্গ দেখতে পেলে তার কাছাকাছি নিঃশব্দে এসে দুপায়ে শক্ত করে ডাল আঁকড়ে প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেহটাকে সামনে ছুঁড়ে দিয়ে দুহাতে শিকার ধরে। ধরার পর দুহাতেই মুখের কাছে নিয়ে এসে চিবিয়ে খায়। আবার দেখা যায়, গাছের ডালে পা আঁকড়ে নিচের দিকে ঝুলে দুহাতে শিকার ধরতে। সেই সময় মাথাটা পিছনে হেলিয়ে মুখ তুলে দুহাতে চিবিয়ে খায়। গাছের

পাতা থেকে বৃষ্টির জল ও শিশির যেমন খায় তেমনি খায় মাটিতে নেমেও। ঝুলন্ত অবস্থাতেও ঐভাবে জল খায়।

বন্দীদশায় প্রথমে বড়ই বন্য থাকে, কামড়ে দেবার চেষ্টা করে এবং কামড়ে বেশ জোর। এই সময় রাগে বিরক্তিতে হিস্ হিস্ শব্দ করতে থাকে। একবার পোষ মানলে প্রভুর খুব ভক্ত হয়ে পড়ে।

90 দিন গর্ভধারণ করে একটি সন্তান চোখখোলা অবস্থাতেই প্রসব করে। ওদের আচার ব্যবহার ও প্রজনন সবই লক্ষ্য করা গেছে বন্দীদশায়। জন্মাবার পর গায়ে ঘন লোমের ভিতর কিছু রুপালি ধূসর চুল থাকে। সেগুলি 11 সপ্তাহের পর পড়ে যায়। দশ মাস বয়স পর্যন্ত দিনের বেলা মাকে আঁকড়েই থাকে। একমাস বয়স হলে মাতৃস্তন্য ছেড়ে অন্য খাবার খায়। দশ মাসেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রায় 10 বছর পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় বাঁচে।

এদের সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের নানা কুসংস্কার আছে। চোখ ও দেহের হাড় নাকি বশীকরণ ও মারণের কাজে লাগে। দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলংকায় যে প্রজাতি তাকে স্থানীয়রা বলেন 'আদাভি মনুষ্য' (লরিস টারডিগ্রেডাস), ইং. স্লেণ্ডার লরিস, তারা আকারে ছোটো। এদের বাঁকে ঝুলিয়ে বিক্রি করতে দেখেছি বশীকরণ ও মারণের জন্য। রোদের কড়া আলো অনভ্যস্ত চোখে সহ্য করতে পারে না, এরা ক্রমে অন্ধ হয়ে পড়ে।



চিতা বিড়াল

আজ থেকে প্রায় 45 বছর আগেকার কথা। গৌহাটি-শিলং হয়ে সিলেট যাবার যে পিচ বাঁধানো রাস্তা ছিল তার তুলনা হয় না। সেই পাহাড়ী পথ যেমন ছিল চড়াই উৎরাই, ঘন ঘন বাঁক, পাশে সুগভীর খাদ আর ঘন সবুজ জঙ্গলে ভরা প্রাকৃতিক পরিবেশের, তেমনি ছিল বিপদসংকুল। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটতো, বিশেষত শিলং-সিলেটের পথে। এখন গৌহাটি-শিলঙের সে রাস্তা আর নেই। অন্য সোজা পথ হয়েছে, থ্রিলটা নষ্ট হয়ে গেছে।

চলেছি এক সতীর্থ বন্ধুর সঙ্গে শিলং। গৌহাটি থেকেই দখল করেছি বাস-চালকের পাশের সিট আমরা দুজনে। গৌহাটি ছেড়ে দশ মাইলের মাথায় যে চেকপোস্ট সেটা পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকেছি। আদিম অরণ্য। বাঁদিকে চলে গেছে নওগাঁর রাস্তা। আমরা সোজা চলেছি। ঘন গাছে ঢাকা মসৃণ পিচের রাস্তা। ডান পাশে গাছে ঢাকা একটা পার্বত্য নদী অনেকক্ষণ ধরে সঙ্গ দিল। দুচোখ মেলে দেখছি অরণ্যের কী বাহার! চাকার ঘর্ষণের হিস্ হিস্ শব্দ ছাপিয়ে কানে আসছে হাজার হাজার ঝিঁঝিঁপোকার আওয়াজ, যেন একযোগে তানপুরা ছাড়ছে।

অনেক পাহাড় ও খাদ পেরিয়ে পেঁছিলাম নংপো-তে। গৌহাটি থেকে শিলং যাবার মাঝ রাস্তায়। এখানে গেট আছে। শিলং থেকে আসা সব গাড়ি

একত্রিত হলে তবে গেট খোলা হবে। ওরা গৌহাটির দিকে গেলে তখন আমরা যাব শিলং-এর দিকে। কারণ একমুখী ছোটো রাস্তা, দুটি গাড়ি পারাপারের স্থান নেই।

আমাদের বাস এত তাড়াতাড়ি এসেছে যে ওদিক থেকে তখনও কোনো গাড়ি আসে নি। তার মানে ঘণ্টাখানেক ওখানে আটকা থাকতে হবে। এদিকে আকাশে মেঘ। ভরদুপুরে সন্ধ্যের ছায়া নেমে এসেছে। অসুস্থ বন্ধুকে রাস্তার পাশে একটা চায়ের দোকানে বসিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে যেদিকে গজিয়ে ওঠা ছড়ানোছিটানো কয়েক ঘরের নংপো গাঁ, সেদিকে পথ ছেড়ে নেমে গেলাম।

পাখির খোঁজে এদিকওদিক গাছের ডালে আগডালে চোখ রাখছি, হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা বেড়া দেওয়া ঘরের পাশে একটা ঝাঁকড়া গাছের ডাল যেটা বেড়া ছাড়িয়ে ছোট্ট উঠোনে গিয়ে পড়েছে, তার শেষপ্রান্তে ওতপেতে বসে তামাটে হলুদ গায়ে কালো ও পাটকিলের ছোপ ও টানে ভরা এক জন্তু।

মনে হল গুলবাঘের বাচ্চা। আমি স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে। জন্তুটা আমার দিকে ফিরে তাকাল। বুঝলাম গুলবাঘের বাচ্চা নয়। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে তার দৃষ্টি যে দিকে ছিল সেইদিকে রাখল। ঝুলেপড়া ডালটার নিচেই গেরস্তর পোষা মুরগীরা চরছে। তার নজর সেই দিকে। আমি থাকাতে অসোয়াস্তি বোধ করছে। তাই ফিরে ফিরে আমায় দেখছে। একবার সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন দেখলাম বিড়ালের চেয়ে পা অনেক লম্বা। তলাটা সাদা। কপালে চারটে লম্বাটে ছোপ, পাশাপাশি এক লাইনে মাথার উপর দিয়ে ঘাড়ে নেমেছে। বাইরে লাইনটা চওড়া, মাঝেরটা সরু। এই দুটো লাইন চলে গেছে পিঠের উপর দিয়ে লেজ পর্যন্ত। বাকি দুটো লাইন ভেঙে গিয়ে লম্বাটে, গোল ও নানা আকারের ছোপে পরিণত হয়েছে সারা দেহে। নলাকার লেজেও ছোপ, ডগায় অস্পষ্ট একটা গোল আঙটি।

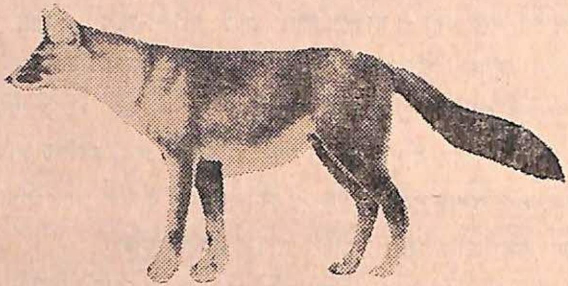
এই সময় শিলং থেকে আসা গাড়িগুলো গেটের কাছে আসাতে সোরগোলের আওয়াজ কানে এল। বাধ্য হয়ে আমাকে চলে আসতে হল, জন্তুটা মুরগীর উপর লাফিয়ে পড়েছিল কিনা তা আর দেখা হল না।

জন্তুটা বিড়ালবংশীয় (ফেলিডি), নাম— চিতা বিড়াল (ফেলিস বেঙ্গলেনসিস) ইং· লেপার্ড ক্যাট। চিতা বিড়াল দেহ মাথা নিয়ে 60 সেমি-র মতো, লেজ 30 সেমি, ওজনে ?-4 কেজি।

বাসস্থান—ভারতের বনাঞ্চল, কাশ্মীর ও হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা, আসামের ভিতর দিয়ে বর্মা ও মালয়েসিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া, প্রধানত মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায়। বড়ো গাছের গায়ের গর্তে বাস করে। এক-এক জায়গায় এক-এক রকমের গায়ের রঙ বলে এদের তিনটি উপজাতির মধ্যে ধরা হয়। অনেক স্থানের দেহের রঙ ধূসর ঘেঁষা, উত্তর কাশ্মীরে একটু লালচে ভাব বেশি। একসময় নিম্নবঙ্গ ও সুন্দরবনে ঘন ঘাস ও ঝোপঝাড়ের জঙ্গলে বেশ দেখা যেত। এখনও আছে কিনা জানি না। হদিস পাবার চেষ্টা করছি।

খাদ্য—এই সুন্দর নিশাচর জঙ্গলবাসী চিতা বিড়াল ছোটো ছোটো পাখি ও জন্তু শিকার করে খায়। দক্ষিণ ভারতে কুর্গে খুব বেশি দেখা যায়। তারা গৃহপালিত হাসমুরগীর সুযোগ পেলেই ধ্বংস করে।

স্বভাব—প্রজননকালীন ব্যাপারস্যাপার সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু উদ্ঘাটন করা যায় নি। মার্চ ও মে মাসে বাচ্চা সংগ্রহ করা গেছে। মনে হয় প্রতি প্রসবে 3-4টি করে সন্তান হয়। গৃহপালিত বিড়ালের সঙ্গে মিলনের ফলে সন্তান হতেও দেখা গেছে।



ঢোল—বুনো কুকুর

বেশ রাতে গিয়ে পৌঁছেছি মেদিনীপুরের শালবনীতে। রাতটা কাটিয়েছি ওখানকার ইন্সপেকশন বাংলোয়। খুব ভোরে উঠে বেরিয়েছি জিপে চেপে। চলেছি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুরী ময়নাকে প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখার জন্যে।

হঠাৎ নজরে পড়ল সাত-আটটি ছোটবড়ো লালচে তামাটে রঙের জন্তু নেকড়ের মতো একদলের। কিন্তু নেকড়েদের মতো এদের লম্বাটে কান নয়, গোল। লেজ বেশ ঝাঁকড়া। নেকড়ের চেয়ে পা, চোয়াল ও নাক ছোটো। চোখের নিচে নাকের পাশে চোয়ালের উপর একটা ছোপ।

জিপ থেমে গেছে। ওরা আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। খালি শিশিতে ফুঁ দিলে যেমন শিসের মতো শব্দ হয় তেমনি আওয়াজ তুলে বনের গভীরে দুলকি চালে চলে গেল।

উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠেছি— বুনো কুকুর, ঢোল (কুওন আলপাইনস) বলে। ইং. ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড ডগ।

ঘাড়ের কাছ পর্যন্ত উচ্চতায় ঢোল 43-55 সেমি, লম্বায় মাথা ও দেহ 90 সেমি, লেজ 40-43 সেমি। ওজনে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ 20 কেজি পর্যন্ত হয়। স্ত্রী-জাতির ওজন অনেক কম।

ঢোলের শারীরিক গঠন নেকড়ে, শেয়াল বা গৃহপালিত কুকুরের থেকে বেশ

কিছুটা তফাতের। নিচের চোয়ালে মাঢ়ীর দাঁত বা পেষক দন্ত 6টি কিন্তু অন্যদের 7টি। স্তনবৃন্ত 12 থেকে 14টি কিন্তু কুকুরদের (ক্যানিস) 10টি। গায়ের লালচে রঙটা এক-এক জায়গায় এক-এক রকম। হিমালয়ের ওপারে লাডাখ তিব্বত ইত্যাদির বাসিন্দাদের ফিকে, হিমালয়ের গাঢ় লাল, উপদ্বীপাত্মক ভারতের লালচের উপর তামাটে আভা।

বাসস্থান—মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় আলতাই পর্বত থেকে মাঞ্চুরিয়া, দক্ষিণে সমগ্র ভারতের বনাঞ্চল এবং মালয়েসিয়ায়, কিন্তু শ্রীলঙ্কায় নয়। মধ্য এসিয়ার ঢোলরা জঙ্গলে থাকলেও মাঝে মাছে দেখা যায় উন্মুক্ত স্তেপভূমিতে। লাডাখ ও তিব্বতে বাস করে বিবর্ণ ও ঠাণ্ডা উচ্চভূমিতে জঙ্গলহীন উন্মুক্ত স্থানে। ভারতের মতো গ্রীষ্মমণ্ডল বা অন্যান্য অল্প উষ্ণমণ্ডলের জঙ্গলে যেখানে খাদ্য রোদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ছায়া এবং পানীয় জলের অভাব কম, সেখানে শুয়ে বসে বুনো কুকুররা বিশ্রাম নেয় বা বসবাস করে।

স্বভাব—নেকড়ের মতো ঢোলরা সামাজিক জীব। দলবদ্ধ হয়েই ঘোরাফেরা ও শিকার করে। এই সামাজিক জীবনটা গড়ে উঠেছে বহুদিন ধরে বাপ-মার সঙ্গে ওঠা-বসা চলাফেরা করার জন্যে। দেখা গেছে, একটি পরিবারের সকলকে নিয়ে একটি দল, কখনও দু-তিনটি পরিবার নিয়ে, আবার কখনওবা বহু পরিবার একত্রিত হয়ে। এই একত্র থাকার ফলে বড়ো বড়ো জানোয়ারদের মারার সুবিধে হয়। দিনেই সাধারণত শিকার করে থাকে, রাতে খুবই কম।

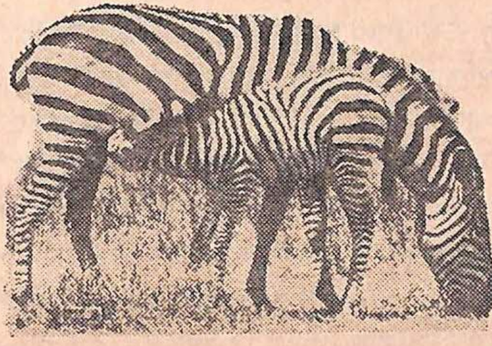
শিকারের পিছনে চলে তীব্র ঘ্রাণ ও দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে। শিকারকে অনুসরণ করে কখনও তাকে জানতে দিয়ে, কখনওবা আড়ালে-আবডালে থেকে। শিকারের পিছনে কখনও জোরে তাড়া দিয়ে দৌড়ে চলে না, চলে ধীরগতিতে একই ছন্দে ক্লান্তিহীনভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখের বাইরে যেতে না দিয়ে ধাওয়া করে। হাজার চেষ্টা করেও শিকার এদের হাত থেকে নিস্তার পায় না। এমনই নাছোড়বান্দা এরা। সাধারণত নিঃশব্দেই চলে। একসময় দলপতি একটু জোরে হাঁক দিয়ে বলে দেয় কিভাবে চলতে হবে। কিভাবে কখন আক্রমণ করতে হবে।

শিকার ভয়ে এবং অতখানি দৌড়েও যখন নিস্তার নেই বুঝতে পারে তখন আরও শ্রান্ত হয়ে পড়ে। ঢোলরা তখন মুখ দিয়ে গোঙানির মতো আওয়াজ করতে থাকে। তারপর শিকারের পাশে এসে পেটে কামড় দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। অন্ত্র ইত্যাদি বেরিয়ে যায়।

খবর আছে এরা দলবন্ধ হয়ে গুলবাঘ ভালুক এমনকি বাঘকেও মেরে থাকে। উপদ্বীপাত্মক ভারতে সাধারণত শিকার করে নানা জাতের হরিণ, বড় দল বেঁধে করে গৌর ও মহিষ। সবচেয়ে প্রিয় শিকার বন্য বরাহ। তিব্বত ও লাডাখে করে বুনো ভেড়া ও নানাবিধ মৃগ। কাশ্মীরে মার্খোর, গোরাল, কস্তুরী মৃগ ও টাহর।

নিম্ন ভারতে প্রজননকাল নভেম্বর-ডিসেম্বর। প্রায় 9 সপ্তাহ গর্ভধারণ করে জানুয়ারি-মার্চে গুহা, পাথরের খোদল বা মাটির ভিতরে গর্তে সন্তান প্রসব করে। কিন্তু কখনও নিজেরা গর্ত খোঁড়ে না। অনেকসময় বহু স্ত্রী ঢোলকে দেখা যায় কলোনির মতো করে একসঙ্গে সন্তান প্রসব করতে। বেশ কিছুটা বড়ো হলে বাপ-মাদের সঙ্গে শিকার ধরতে বের হয়, তখন গ্রীষ্মে ও বর্ষায় অন্যান্য এইরকম দলের সঙ্গে মিলিত হয়।

অস্ট্রেলিয়ায় যে হলদেটে পাটকিলে বুনো কুকুর ডিঙ্গো (ক্যানিস ডিঙ্গো) দেখা যায়, তারা কিন্তু ওখানে ইউরোপীয়দের পদার্পণের আগে থেকেই ছিল। আদিবাসীরা বিভিন্ন দ্বীপ থেকে যেসব গৃহপালিত কুকুরদের এনেছিল তারাই পরে বন্য হয়ে যায়।



জেব্রা

আলিপুর পশুশালায় বন্দী জেব্রাকে উত্যক্ত করার নানা কায়দা দেখে মানুষের বন্যপ্রাণীদের প্রতি আচরণের অন্ধকার দিকটার কথা মনে পড়ে যায়। এই পশুশালাতে মানুষের বিকৃত আচরণের কত দিকই না দেখেছি।

একবার দেখেছিলাম তিনজন সঙ্গী সহ এক মাস্তানকে গণ্ডারের নাকে এক ডিবে নস্যি ঢেলে দিতে। গণ্ডারটি না পারছে হাঁচতে, না পারছে মাথাটা নিচু করে নস্যি ঝেড়ে ফেলতে, চোখে জল আসছে। অসহায় করুণ মুখের অবস্থা! গণ্ডারের এই অবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে সজোরে ধিক্কার দিতেই ঝঙ্কার দিয়ে তাঁরা বলে উঠলেন, 'থামুন মশায়, জ্ঞান দিতে হবে না ইত্যাদি……।' মানে মানে সরে পড়তে হল। পশুশালার অফিসে খবর দিয়েও কিছু হল না। তখন অবশ্য পশুশালার কর্তাব্যক্তিরা এখনকার মতো এত সচেতন হন নি।

আরেকবার দুই অবাঙালী ভদ্রলোকের কথোপকথন কানে এসেছিল গণ্ডারের থাকার গণ্ডির ধারে। তর্ক চলছে এত বড় জন্তুকে বিষ দিলে মরবে কিনা। একজন বলছেন হ্যাঁ, অপরজন না। তারপর মোটা টাকার বাজি ধরতে ধরতে

চলে গেলেন। কদিন বাদে খবর পেলাম বিষপ্রয়োগের ফলে একটি গণ্ডার মারা গেছে।

একটি ঘটনা খুবই উপভোগ করেছিলাম। বাঁদরদের ঘর 'গাব্বে হাউস'-এর সামনে কয়েকজন তরুণ খুবই উত্যক্ত করছে বন্দী জীবদের। একটি গোদা বাঁদর শেষমেষ সহ্য করতে না পেরে কিছুটা পিছু হটে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে লাফিয়ে এসে গরাদের উপর ওঠে। তারপর আচমকা এই ব্যবহারে ভয়ে আতঙ্কে পিছিয়ে আসা উত্যক্তকারীদের মুখে মাথায় সজোরে মূত্রত্যাগ করে তাদের চরম অবস্থায় ফেলে। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে সরে পড়ার সময় বলে এসেছিলাম, 'টিট ফর ট্যাট, ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।' বাঁদরের সঙ্গে বাঁদরামির ফল হাতেহাতে।

পশুশালায় জেব্রাকে দেখে মন চলে যায় সাহারার দক্ষিণে, পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমতল ভূমি, ঘাসে ভরা প্রান্তর সাভানা ও কিছু পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে এই অযুগ্ম-খুর বর্গের (পেরিসোড্যাকটাইলা) অন্তর্গত ঘোটক বংশের (ইকুইদি) প্রজাতি জেব্রার (ইকুয়াস বারচেল্লি, ইং. গ্রাণ্ট'স জেব্রা) বাসস্থান। যেখানে ওরা 10-12র দলে কখনও বা শত শত চরে বেড়ায়। প্রায়ই দেখা যায় যুগ্ম-খুর বর্গের (আর্টিওড্যাকটাইলা) অন্তর্গত গবাদি বংশের (বভিদি) ওয়াইল্ডবীস্ট (Connochaetes) বা উটপাখিদের সঙ্গে মিলেমিশে চরতে।

জেব্রা লম্বায় মাথা দেহ 2-2·4 মি, লেজ 47-57 সেমি, ঘাড়ের কাছ পর্যন্ত উচ্চতা 1·2—1·4 মি। ওজনে প্রায় 350 কেজি। গায়ের সাদা-কালো ডোরা দাগেই জেব্রাকে চেনা যায়। সারা দেহে নানাভাবে ছোটোবড়ো সরুমোটা কালো ডোরা দাগে ভর্তি। খাড়া কেশর, লেজের ডগায় চুলের গুচ্ছ।

জেব্রার প্রজাতি বা উপজাতির মধ্যে ডোরা দাগের কিছুটা তফাত থাকবেই, এমনকি একই প্রজাতির মধ্যেও ডোরাদাগের তফাত দেখা যায়। এদের মধ্যে একটি আজ অবলুপ্ত, 'সেটি গ্রেভি'স জেব্রা' (Dolichohippus)। এই প্রজাতির মাথা ও কান বড়ো এবং ডোরাদাগ ছিল সরু। মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত কেশর ছিল খুব বড়ো। লাজুক প্রকৃতির এই প্রাণীটি ইথিওপিয়ার মরুভূমির পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে বাস করত।

পাহাড়ী জেব্রার নাক কালো এবং প্রলম্বিত চোয়ালে কালো ও লালের ডোরা। কানে আনুভূমিক সাদা ডোরা দাগ। বাকি দেহ সাদা-কালো, পিছন-

দিকের দাগ বেশ চওড়া। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবলুপ্ত কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ও অ্যাঙ্গোলার সমুদ্রের ধারের পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়।

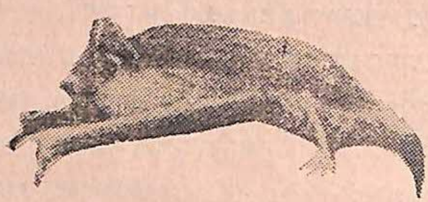
সাধারণ 'বারচেলস্ গ্রাণ্ট'স' জেব্রার একটি উপজাতি 'ডামারল্যাণ্ড জেব্রা'র পায়ের ডোরা দাগের পাশে ছায়া ডোরা এবং এদের দেখা যায় দক্ষিণ কঙ্গো ও উত্তর দক্ষিণ আফ্রিকায়। দ্বিতীয় উপজাতি, 'সেলু'স জেব্রা'র সাদা-কালো ডোরা দাগ কাছাকাছি ঘনসন্নিবিষ্ট এবং পা পর্যন্ত তা নেমে এসেছে। তৃতীয় উপজাতি, 'পূর্ব আফ্রিকীয় জেব্রা'র দাগগুলি খুব গাঢ়। দেখা যায় জিম্বাবোয়ে থেকে ইথোপিয়া এবং উত্তর ও পশ্চিম সুদানে।

অবলুপ্ত 'কোয়াগা' (Quagga) সাধারণ জেব্রারই উপজাতি। একসময় দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচুর ছিল কিন্তু সাদা চামড়ার অধিবাসীরা তাদের ক্রীতদাস ও স্থানীয় শ্রমিকদের খাদ্য যোগান দেওয়ার জন্যে মেরে শেষ করে। শেষ যে জীবিত প্রাণীটি ছিল তা 1883 খ্রিস্টাব্দে আমস্টার্ডামে আর্টি'স পশুশালায় দেহ রাখে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে মাঝে মাঝে গুজব রটে কোয়াগা দেখা গেছে।

পৃথিবীর সব পশুশালাতেই জেব্রা রাখা হয়। ঘোড়ার সঙ্গে মিলনসাধন করিয়ে 'জেব্রড়া' (Zebroses) ও 'ঘোড়াব্রা' (Horsebras) বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করা হয়েছে। ঘোড়ার মতো সহজে পোষ মানতে চায় না বলে গৃহপালিত করা অসম্ভবের পর্যায়ে। কেউ কেউ গাড়িতে জুতে চালাতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু সফল হন নি। জেব্রা লাজুক ও ভীরু প্রকৃতির হলেও সময়ে সময়ে মরিয়া হয়ে আত্মরক্ষার জন্যে সামনের ও পিছনের পা ছোঁড়ে এবং মারাত্মকভাবে কামড়েও দেয়।

সিংহের প্রধান খাদ্য। ঘাসের জঙ্গলে এবং এবড়োখেবড়ো জমির ভিতর এমনভাবে মিশে থাকে যে সহজে নজরে পড়ে না। দেহের অভ্যন্তরে নানা জাতের আন্ত্রিক পরজীবীতে ভর্তি এবং এই পরজীবীরা না থাকলে এরা হজমশক্তি একদম হারিয়ে ফেলে।

আফ্রিকাবাসীদের বিশ্বাস এবং সেটা জোর দিয়েই বলে এদের গায়ের রঙ আসলে কালো তার উপর সাদা ডোরা। সাদা চামড়ার অধিবাসীরা বলে ওরা সাদা এবং তার উপর কালো ডোরা দাগ।



চামচিকা

কদিন আগে সন্ধ্যেবেলায় ঘরে বসে আমরা কজনে তুমুল আড্ডা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ এক উড়ন্ত জীব ঘরে ঢুকতেই সকলেই ভয়ে শশব্যস্ত হয়ে উঠল। আলোপাখা থেকে আমি একটু দূরে ছিলাম। বললাম, শিগগির আলোপাখা নিবিয়ে দাও, ও ঘর ছেড়ে চলে যাবে, মশামাছি খেতে ঘরে ঢুকেছে, পাখাটা আগে বন্ধ কর।

এঁকেবেঁকে সে খুব দ্রুত উড়ছে। যেদিকে যাচ্ছে সেদিকের সকলের ভয়টা প্রখর হয়ে উঠছে। যেন সাক্ষাৎ যম ঘরে ঢুকেছে। কিন্তু আলোপাখা নেভানর আগেই জীবটা পাখার ব্লেডের আঘাতে ছিটকে ঘরের কোণে গিয়ে পড়ল।

তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে তুলে বাঁ-হাতের চেটোয় রাখলাম। কুৎসিত দেখতে হলেও এদের একটা বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য আছে। এরা ধ্বনিপারের তরঙ্গ সৃষ্টি করে শব্দ প্রেরণ করে এবং সেই শব্দ যে বস্তুর গায়ে ধাক্কা লেগে ফিরে আসে তা ধরতে পারে।

পরীক্ষা করে দেখলাম পাতলা চামড়া যাকে বলে ঝিল্লী, তার মধ্যে দিয়ে দুই বাহু। পুরোবাহু খুব লম্বা। তার শেষে চারটে আঙুল ছাতার শিকের মতো ছড়ানো। বুড়ো আঙুল উঁচু হয়ে বাইরে বেরনো। পা-ও তাই, তবে দুই পায়ের পাতা ও নখর সমেত পাঁচটি করে আঙুল বাইরে বেরনো। লেজও ঝিল্লীর মধ্যে। উলটে-পালটে দেখলাম কোনো অংশ

ভাঙে নি। কেবল ধাক্কা খেয়ে অবশ হয়ে আছে। কালো ছোটো চোখ পিট-পিট করে তাকাচ্ছে। দেহের তুলনায় চওড়া কান ত্রিকোণাকার, উপরটা গোল এবং কানে অতিরিক্ত পর্দা (ট্যাগাস)। লম্বাটে চোয়াল ও নাক ভোঁতা, চওড়া হাঁ। মাথার চাঁদি, কপাল থেকে চোখের উপর পর্যন্ত রোমশ, নিচটা নয়। জীবটাকে বাইরের বারান্দার পাঁচিলের উপর খুব আস্তে রাখলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে নিজেই উড়ে চলে গেল।

জীবটি নিশাচর করপক্ষ বর্গের (কিরোপটেরা, গ্রীক কিরোস=হাত, প্টেরন=ডানা) অন্তর্গত ক্ষুদ্র-করপক্ষ উপবর্গের (মাইক্রকিরোপটেরা) এক প্রজাতি। নাম—চামচিকা (পিপিস্ট্রেলাস করোমানড্রা), ইং· ইন্ডিয়ান ব্যাট, পিপিস্ট্রিল। ক্ষুদ্র-করপক্ষ বা চামচিকারা ৭টি বংশে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। চামচিকার দেহ-মাথা পৌনে **5**, লেজ **4**, ডানার বিস্তার 17-18 সেমি।

বাসস্থান—সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এসিয়া।

খাদ্য—মশা, মাছি, ডাঁশ ও ছোটো পতঙ্গ।

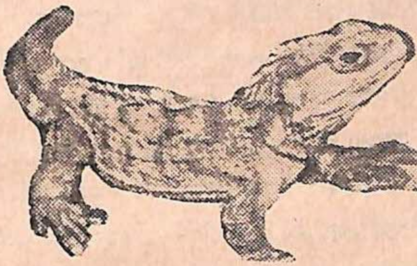
স্বভাব—চামচিকারা একাকী বা দলবদ্ধ হয়ে ছাদের কার্নিসের তলায়, বৃষ্টির জলের পাইপের পাশে, ইট বা কাঠের ফাঁকে, মন্দির গির্জা বা মসজিদের ভিতরে বিশ্রামের জায়গা করে নেয়। শীতঘুম দেয় অক্টোবরের শেষ থেকে মার্চের শেষ। এদের জীবনযাপন ও প্রজননের বিস্তারিত বিবরণ এখনও জানা যায় নি। সহজেই পোষ মানে। দেখা গেছে 35-44 দিন গর্ভধারণ করে মে মাসে একটি সন্তান প্রসব করে। আবার সেপ্টেম্বরেও স্ত্রী-চামচিকাকে পূর্ণ গর্ভবতীরূপে দেখা গেছে। তাই মনে হয় সময়বিশেষে দুবার বাচ্চা প্রসব করে। ইউরোপীয় প্রজাতিকে (পিপিস্ট্রেলাস পিপিস্ট্রেলাস) কাশ্মীরে দেখা যায়।

আরেকটি উপবর্গ বৃহৎ-করপক্ষ (মেগাকিরোপটেরা) তাদের আমরা বাদুড় বলি। এদের ফলাশী বা ফলাহারী বাদুড়ও বলা হয়। ইংরেজিতে কিন্তু সকলেই 'ব্যাট'। আমরা যে বাদুড় দেখি তার ইংরেজি নাম, 'ফ্লাইং ফক্স'।

বাদুড়-চামচিকারা একমাত্র স্তন্যপায়ী যারা সত্যিকারের উড়তে পারে। আর যেসব উড়ন্ত স্তন্যপায়ী পশুরা আছে, যেমন উড়ন্ত সমঙ্গুরি (ফ্যালাঞ্জার), উড়ন্ত কাঠবিড়াল, উড়ন্ত লিমার ইত্যাদি, তারা কেউই ওড়ে না, তারা শরীরের পাশ থেকে প্যারাসুটের মতো ঝিল্লীর সাহায্যে কেবলমাত্র ভেসে চলে। মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে শূন্যে বিচরণ করে, নিজস্ব ক্ষমতায় নয়। বাদুড়-চামচিকারা

যে ওড়ে তা ঠিক পাখির মতো ওড়া নয়। তারা ওড়ার সময় যেভাবে চামড়া বা ঝিল্লীর পাখা ও সাঁতারুর মতো পা চালায় তা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় তারা উড়ছে না, বাতাসে সাঁতার কাটছে।

এরা প্রাগৈতিহাসিক কীটভুকের (ইনসেকটিভোরা) কোনো শাখা থেকে প্রথম উদ্ভূত হয়। পুরানূতনে (পালিওসিন) অর্থাৎ 6 থেকে 5 কোটি বছর আগে এরা কীটভুকের সেই শাখা যারা প্রয়োজনের তাগিদে গাছে চড়া আয়ত্ত করেছিল। গাছ থেকে ঝাঁপ মেরে উড়ন্ত পোকামাকড় ধরার প্রয়োজনে যে চেষ্টাটা তখন করত তা ডুবন্ত কোনো মানুষ যেমন শূন্যে হাত বাড়িয়ে কিছু যেমন ধরে জলের উপর ওঠার চেষ্টা করে ঠিক তেমনই। কয়েক শতাব্দী ধরে সেই চেষ্টার ফলে বৃক্ষবাসী লাফমারা কীটভুক জীব জীব-বিবর্তনে ওড়াটা আয়ত্ত করে ক্রমে ক্রমে বর্তমানের বাদুড়-চামচিকায় পরিণত হয়েছে। এমনকি, কয়েকটি বাদুড়-চামচিকার ঝিল্লী-ডানা, লম্বা আঙুল শুদ্ধ হাত-পা সব কেটে বাদ দিলে একটা ছুঁচো ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। যদিও এদের অভ্যন্তরীণ শারীরস্থানে কিছু অদলবদল আছে, তার ভিত্তি খাদ্য ও জীবনযাত্রা প্রণালীর তফাতে।



জীবন্ত জীবাশ্ম তুয়াতারা

পৃথিবীতে বহু রকমের বিচিত্র জীবজন্তু দেখা যায়, তাদের নাম অনেকে জানলেও তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর আমরা রাখি না। সেই রকম একটি জীব—নিউজিল্যাণ্ডের আদিবাসী মাওরি, যারা তাহিতি দ্বীপ থেকে 1800 মাইল 'ওয়াহা' চেপে এসেছিল ইওরোপীয়দেরও অনেক আগে, তাদের গাঁওঘর বা জমায়েত ঘর যাকে ওরা বলে 'মারে' (murae), সেখানে ঢুকলে নানারকম কাঠখোদাইয়ের মূর্তির মধ্যে একটি বড়ো মূর্তির প্রতি আকৃষ্ট হতে হয়। সেটা লম্বাটে ধরনের কুমির বা অন্য কোনও সরীসৃপ কিনা তা ঠিক বোঝা যায় না।

মাওরিরা খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে এই সরীসৃপ জাতীয় জীবটির নাম উচ্চারণ করে—'তুয়াতারা'। এই মূর্তিটিকে ওরা মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে মনে করে। ওদের উপকথায় এই সরীসৃপ অগ্নিদেবীর বাহনরূপে বর্ণিত হয়েছে। কথিত আছে, কোনও এক সময়ে এই গিরগিটি-সদৃশ তুয়াতারা অগ্নিদেবীর বিদ্রোহী নাতিকে হত্যা করে পৃথিবীতে প্রথম মৃত্যু আনে। এর আগে পৃথিবীতে মৃত্যু বলে কোনো কিছু ছিল না। তুয়াতারা বা ওই জাতীয় জীবকে এখনও খোদাইকররা দুঃখ অশান্তি ও দুর্বিপাকের প্রতীক বলে চিহ্নিত করে।

তুয়াতারা নাকি অমর। পৃথিবীর আদিকাল থেকে তারা বাস করে আসছে।

এখন একমাত্র নিউজিল্যান্ডেই বাস করে। কিন্তু কোথায় ওরা থাকে তা আদিবাসীরা বাইরের লোককে সহজে বলতে চায় না।

নিউজিল্যান্ডের উত্তরপূর্ব দিকের সমুদ্র উপকূলে এবং উত্তর ও দক্ষিণ দ্বীপের মাঝে কুক প্রণালীর ভিতর কিছু ছোটো দ্বীপ আছে। সংখ্যায় তারা প্রায় গোটা কুড়িক হবে। প্রত্যেকটি দ্বীপই পাহাড়ী ও পাথুরে এবং সেই সঙ্গে সব সময় সেখানে ঝড়ো হাওয়া বয়। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ওই ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে বাস করে বহু সামুদ্রিক পাখির ঝাঁক। তার মধ্যে দেখা যায় অতিবাত বংশের (প্রসেল্লারিয়িফরমেস) দুই পাখি—জলজাঙ্ঘিক (স্টর্ম পেট্রেল) ও তরঙ্গকাক (শীয়ারওয়াটার)।

এই মোটাসোটা গাবদাগোবদা মাংসল তরঙ্গকাকদের নিউজিল্যান্ডবাসীরা বলে খাসী পাখি। নামে খাসী হলেও খুব যে একটা ভালো খেতে তা নয়। লবণজারিত যে পাখি খাদ্য হিসেবে ওখানকার বাজারে বিক্রি হয় তার স্বাদকে তৈরি করে নিতে হয়। কিন্তু টাটকা পাখি ঠিকমতো রাঁধতে পারলে মুরগীর মতোই খেতে লাগে।

জলজাঙ্ঘিক বা তরঙ্গকাকরা পাহাড়ের গায়ে পাথরের ফাঁকে মাটিতে সুড়ঙ্গ করে বাসা বানায়। ঠিক পাশাপাশি আর-এক জীব ঠিক ওদের মতো মাটি খুঁড়ে বাসা বানায়। যে পাহাড়ী দ্বীপে জলজাঙ্ঘিক ও তরঙ্গকাকরা বাসা বানায় না, সেই দ্বীপে এরাও থাকে না। এরা নিশাচর, তবে খুব ঠাণ্ডা পড়লে রোদ পোয়াতে দিনের বেলায় গর্তের বাইরে আসে।

সরীসৃপ শ্রেণীর মধ্যে চারটি বর্গ। যথা—কচ্ছপাদি, চঞ্চুমস্তক, সর্পাদি, যার দুটি উপবর্গ—গিরগিটিকুল ও সর্পকুল এবং কুমিরাদি অর্থাৎ ঘড়িয়াল, কুমির, অ্যালিগেটর ও সেম্যান।

কুড়ি কোটি বছর আগে গিরিযুগে (পারমিয়ান) এই জাতের সরীসৃপ আমাদের পৃথিবীর বুকে বিচরণ করতে শুরু করেছিল। তখনও ভীমসরট অর্থাৎ ডাইনোসরদের অবাধ রাজত্ব শুরু হয় নি। হয়েছিল বহুকাল পরে, আনুমানিক 15 থেকে 12 কোটি বছর আগে মহাসরট যুগে (জুরাসিক)। এই জীবন্তজীবাশ্মেরই নাম—তুয়াতারা (স্ফেনোডন পাংটাটাস)।

চঞ্চুমস্তক বর্গে এই একটি মাত্র প্রাণী আজ পৃথিবীর বুকে বাস করছে। গিরগিটি সদৃশ দেখতে হলেও এদের দাঁতের গঠন ভিন্ন হওয়ার জন্য একটি

আলাদা বর্গে ফেলা হয়েছে। এরা কীলকদন্তী গণের (রাইনচোকেফালিয়া) এক প্রজাতি। আর কোনও প্রজাতি নেই। এই বর্গ ও গণের নাম এসেছে উপরের পাটিতে সামনের দাঁতগুলো কোদালের মতো বাঁকানো ভাবে বসার জন্যে পাখির চঞ্চুর মতো মুখটা দেখায়। এদের দুজোড়া নাক। বাইরের দিকের কানের কোনও গর্ত নেই এবং মাথার ঠিক চাঁদির উপরে তৃতীয় চক্ষুর লুপ্তপ্রায় চিহ্ন দেখা যায়। খুব সন্তর্পণে ভালো করে ব্যবচ্ছেদ করলে অক্ষিতারা ও অক্ষিপুটের অস্তিত্ব বোঝা যায় কিন্তু বর্তমানে ওই তৃতীয় নয়ন দিয়ে দেখার কোনও কাজই হয় না, এমনকি ওই চোখে আলোর তারতম্যও অনুভূত হয় না। পূর্ণ বয়স্কদের এই তৃতীয় নয়ন মোটা চামড়ায় ঢাকা থাকে। এরা লম্বায় প্রায় দু'ফুট পর্যন্ত হয়।

নানা রঙের তুয়াতারা দেখা যায়। কালচে বাদামী থেকে ময়লাটে সবুজ এবং কারুর কারুর আবার এর উপর লালের ছোপ থাকে। মাথার শেষ থেকে পিঠের উপর দিয়ে লেজের প্রায় ডগা কাঁটা কাঁটা চূড়োয় ভরা। শরীরের উপরাংশ দানা দানা আঁশে এবং এদিকওদিক ছড়ানো হলদে ছিটে ভরা। পায়ে তীক্ষ্ম নখরযুক্ত পাঁচটি করে আঙুল এবং আঙুলগুলো কিছুটা ঝিল্লীযুক্ত। এদের ডাক কর্কশ, অনেকটা ব্যাঙের মতো।

তুয়াতারা এমনিতে শান্ত প্রকৃতির, কিন্তু প্রয়োজনে অর্থাৎ আত্মরক্ষার্থে আঁচড়াতে এবং কামড়াতে পারে বেশ।

তুয়াতারার প্রধান খাদ্য মাকড়সা, ঝিঁঝিঁপোকা এবং নানা প্রকারের কীট ও তাদের শূক। সময়ে সময়ে প্রতিবেশী খাসী পাখি বা তরঙ্গকাকদের সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকে তাদের ডিম ও বাচ্চা তো খায়ই, এমনকি ধাড়ি পাখিদেরও।

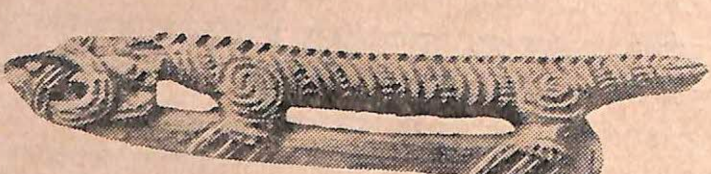
অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডব্লু এচ ডবিন তুয়াতারাকে বিশেষ-ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে এই প্রাণীটির বিপাকশক্তি অত্যন্ত নিচুমানের এবং বড়ো হতেও অসম্ভব সময় নেয়। যখন খুব সচল অবস্থায় থাকে তখন সাত সেকেন্ডে একবার নিশ্বাস নেয় এবং সময় বিশেষে প্রায় এক ঘণ্টাও নিশ্বাস না নিয়ে থাকতে পারে। শরীরে ব্যথাবোধ একদম নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে পা বা বুকের হাড় ভাঙলেও কোনও কিছুই অনুভব করে না।

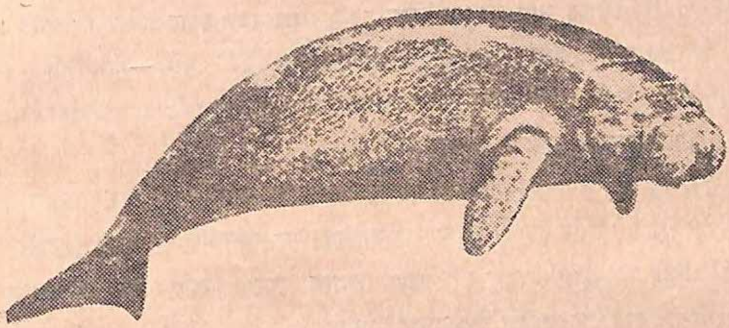
তুয়াতারার ডিম পাড়া এবং ডিম ফোটাও খুব উদ্ভুত ধরনের। জানুয়ারি মাসে তারা স্ত্রী বা স্বামী খোঁজে। তারপর চুপচাপ। সেই অক্টোবর বা

ডিসেম্বরে গিয়ে মাটি খুঁড়ে অগভীর বাসা বানায়। তারপর 5 থেকে 15টা সাদা প্রায় এক সেমি লম্বা শক্ত খোলার ডিম পেড়ে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। 15 মাস পরে আপনাআপনি ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। আর কোনও সরীসৃপের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরতে এত সময় নেয় না।

দেহের বাড়ের হারও খুব আশ্চর্য রকমের আস্তে। তুয়াতারা সাধারণত 20 বছর বয়েস না হলে সঙ্গী বা সঙ্গিনী খোঁজে না। 50 বছর বয়েসে এরা পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করে। সাধারণত এরা একশ বা তারও কিছু উপরে বাঁচে।

একসময় তুয়াতারা প্রায় লোপ পাবার অবস্থায় পেঁছেছিল, কিন্তু নিউজি-ল্যান্ড সরকার ঠিক সময়ে হস্তক্ষেপ করায় এবং সরকারি প্রচেষ্টায় তা বন্ধ হয়। এখন এই বিচিত্র জীবের আর সে ভয় নেই। নিউজিল্যান্ড সরকারের সৌজন্যে লণ্ডন ও এডিনবরার চিড়িয়াখানায় একমাত্র এই জীবন্ত জীবাশ্মকে দেখতে পাওয়া যায় এবং ওই সরকার পৃথিবীর কোনও কোনও জুওলজিক্যাল সোসাইটির আবেদনে মাঝে মাঝে এদের পাঠিয়ে থাকেন।





ডুগং

পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত প্রাণীর খবর পাই যাদের সঙ্গে অন্য কোনও প্রাণীর আকৃতি বা চরিত্রগত মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়ে পড়ে। সেই রকম প্রাণীর তিনটি প্রজাতির মধ্যে একটি আজ অবলুপ্ত। সেটা ঘটেছে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই মানুষের লোভের ফলে। বাকি দুটি এই বিংশ শতাব্দীতে এখনও পর্যন্ত অল্প কিছু টিকে থাকলেও মনে হয় বেশিদিন আর থাকবে না, যদি না উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

রোমক লেখক ও জ্ঞানী প্লিনি (23-79 খ্রিঃ) তাঁর বই 'ন্যাচারল হিস্ট্রি'তে প্রথম উল্লেখ করেন। তার আগে মহাকবি হোমারের (850 ? খ্রিঃ পূঃ) কাব্য 'অডিসি'তে কাল্পনিক কাহিনী 'অডিসিউস ও সাইরেন'-এর কথা পাই। বাস্তব সাইরেনদের কোনো সংগীত ক্ষমতা নেই। কিন্তু এরপর থেকেই সব দেশের রূপকথায় মৎস্যকন্যার অর্থাৎ যার উপরাংশ মানবী নিম্নাংশ মাছের, আবির্ভাব ঘটে। এমনকি 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট'-এও এই প্রাণীটির কথা উল্লেখ আছে, যেখানে হিব্রুরা সিনাইয়ের ভিতর দিয়া বিশাল নৌকোকে (Ark টেনে নিয়ে যাবার পথে বিছিয়ে ছিল এই প্রাণীর চামড়া। পরবর্তীকালে রূপকথাকে জোরদার করে কোনো কোনো প্রত্যক্ষদর্শী নাবিকের বিবরণ। যেমন, হঠাৎ দেখা

গেল অদূরে দুহাত দিয়ে ধরে রাখা স্তন্যপানরত শিশুকে ক্রোড়ে নিয়ে সমুদ্রের বুকে ভেসে উঠেছে এক রমণীর উপরাংশ। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে এই মৎস্য-কন্যারূপীদের বিষয়ে আর অজানা কিছু নেই, কল্পনারও কোনো অবকাশ নেই।

সমুদ্রের গরু বা সিন্ধু-গব বর্গে (সাইরেনিয়া) দুটি বংশ—ডুগংগিদি ও ত্রিচেডিদি তিনটি প্রজাতিতে বিভক্ত। তার মধ্যে ডুগংকে (Dugong dugon) অনেকে দেখেছেন। নামটি মালয়ী।

সমুদ্রের গরু ডুগং-এর বাসস্থান লোহিত সমুদ্র, আফ্রিকার পূর্ব উপকূল, কচ্ছ উপসাগর, মানার উপসাগর, বঙ্গোপসাগরের কয়েকটি দ্বীপের ধারে, শ্রীলঙ্কার উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রকূল, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, মলাক্কা থেকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশের উপকূলবর্তী সমুদ্র।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সমুদ্রের গরম জলের স্তন্যপায়ী এরা। কখনও গভীর সমুদ্রে বা মিষ্টি জলের নদীর মুখে বা ভিতরে দেখা যায় না। খানিকটা সীলমাছের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

পূর্ণ বয়স্করা গড়ে লম্বা 2·5 থেকে 3·2 মি। পুরুষ লম্বায় 275 সেমি, ওজনে 170 কেজি। স্ত্রী লম্বায় 243 সেমি, ওজনে প্রায় 140 কেজি। চামড়ার রঙ পাটকিলে বা ধূসরাভ। সমান্তরালে ছড়ানো লেজের পাখনা চওড়া, মাঝখানে একটু খাঁজ, দুটি কোন সুঁচলো। সামনের প্রত্যঙ্গ বা পাখনা চওড়ার চেয়ে লম্বায় বেশি। পূর্ণবয়স্কা স্ত্রী-জাতির মানবীর ন্যায় দুটি সুপুষ্ট স্তন। স্তনের পাশেই সামনের পাখা। তলদেশ মোটামুটি চ্যাপ্টা, পিঠ ও দেহের দুপাশ গোলাকার। ঘাড় বলে কোনো বস্তু নেই। মাথা বেশ বড়ো, প্রায় বুলডগ মার্কা। মুখ ছোটো, উপরের মাংসল ঠোঁট ঘোড়ার খুরের আকারে নিচের ঠোঁট ছাপিয়ে নিচে নেমেছে। উপরের ঠোঁটের পিছনে থাকে একজোড়া বড়ো ছেদন বা কৃন্তক দন্ত। কষের দাঁত উপর নিচে তিনটি করে। বয়সের সঙ্গে তিনটে থেকে একটা করে বেড়ে ছটা পর্যন্ত হয়। শরীরে তিন রকমের চুল। এক, গোলাকার চাকতির মতো মুখের উপর, দুই নিচের চোয়ালে, তিন সারা দেহে লেজ ও সামনের প্রত্যঙ্গ সমেত। মুখে উপরের চোয়ালের উপর সরু লম্বা শক্ত চুল সংবেদনশীল, দুপাশে এবং তলায় চোয়ালের চুল ছোটো ও ভোঁতা, অনেকটা শজারুর কাঁটার মতো। নাকের ছ্যাঁদা মাথার উপরে অর্ধ-চন্দ্রাকারে। চোখ ছোটো, গুটির আকারে ভিতরে বসা এবং চক্ষুগ্রন্থি পরিপুষ্ট। কান 10 সেমি-র মতো গোলাকার ছ্যাঁদা মাত্র।

লোনা জলের ডুগং অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন এবং অলস। দেহটাও সেইভাবে তৈরি। মৎস্যকন্যার রূপে সন্তানক্রোড়ে একমাত্র দেখা যায় লোহিত সমুদ্রেই। অন্য কোথাও দেখা যায় বলে নথিভুক্ত হয় নি। মানার উপসাগরে একসময় খুবই দেখা যেত। কিন্তু সুস্বাদু মাংস ও তেলের লোভে আজ ক্বচিৎ দু-একটিকে দেখা যায়। একা বা জোড়ায় সাধারণত ঘোরাফেরা করলেও সময়বিশেষে তিন থেকে ছয়ের দলেও বিচরণ করে। স্বভাবে খুবই স্নেহপরায়ণ। একের প্রতি অপরজন খুবই অনুরক্ত। জলের নিচে বা উপরের যে কোনো শব্দে খুবই ভীত হয়ে পড়ে। শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ম, আস্বাদন ক্ষমতাও বেশ কিন্তু দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ। গায়ে এক ধরনের তীব্র গন্ধ। ডুগং খুব তাড়াতাড়ি নিশ্বাস নিয়ে নাকের ছ্যাঁদা পর্দা দিয়ে বন্ধ করে ডুব দিয়ে চলে যায় একদম জলের তলায় অ্যালজি ও জলজ ঘাসের সন্ধানে। তাই তাদের খাদ্য। সবুজ ছাড়া অন্য কোনও রঙের ঘাস বা অ্যালজি খায় না। জলের তলায় ঘাস ছেঁড়ে সমূলে, তারপর তাকে নাড়িয়ে বালি ঝেড়ে ভেসে উঠে পাড়ের উপর জমা করে রাখে। ঘাস বা অন্য কোনো সবুজ উদ্ভিদ খামচা মেরে ছেঁড়ে না, পরিষ্কার একটি লাইন ধরে ছিঁড়ে চলে। দিনের বেলায় বিশ্রাম নেয় গভীর জলের তলায়। রাত্রে উঠে এসে পাড়ে রাখা খাদ্য খায়।

প্রজননকাল বছরের যে কোনও সময়ে। এগার মাস গর্ভধারণের পর একটি সন্তান প্রসব করে। সন্তানকে পালন করে জলের তলায়। কখনও দেখা যায় সন্তানকে পিঠে করে নিয়ে ঘুরছে। স্ত্রী-জাতিই সন্তানপালনে মুখ্য ভূমিকা নেয়।

যেখানে ডুগংকে দেখা যায় স্থানীয় অধিবাসীরা সেখানেই হয় জাল ফেলে না হয় কোনো অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করে তার দামী তেলের জন্য যা তার অন্তস্ত্বক চর্বি বা ব্লাবার থেকে নিষ্কাষিত করা হয়। এই তেলের নাকি অলৌকিক গুণ, যে কোনো রোগের মহৌষধ। চর্বি বিরেচকের কাজ করে। মাংস সুস্বাদু। উপরে কর্তন দন্ত গুঁড়ো করে খাওয়ানো হয় খাদ্যে বিষক্রিয়া থেকে মুক্তিলাভের জন্য। মাথার ঘিলু খেলে মাথা ধরা সেরে যায়, বিশেষত যারা সাইনাসে ভোগে। চক্ষুগ্রন্থির যে অশ্রু তা বশীকরণে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে ডুগং-এর অস্তিত্ব রক্ষা করাটা খুবই বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

1742 খ্রিঃ ক্যাপ্টেন ভাইটাস বেরিং, যাঁর নামে বেরিং সমুদ্র ইত্যাদি, তিনি একবার একটি ছোটো দ্বীপে আটকা পড়ে দেখেন ডুগং-এর চেয়েও বিশালাকার এক প্রাণী। বেরিং সমুদ্রের কোমানডর্সকি দ্বীপরাজির বাসিন্দা ছিল তারা। জার্মান প্রাণীবৃত্তান্তবিদ জিয়র্গ উইলহেলম স্টেলার খবর পেয়ে সেখানে যান। তিনি দেখেন এরা লম্বায় নাকের ডগা থেকে লেজের চ্যাপ্টা পাখনা পর্যন্ত 752 সেমি, ব্যাস 620 সেমি। পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীর ওজন 4 হাজার কেজি। দেহের তুলনায় মাথা ছোটো। গায়ে কোনো লোম নেই, সারা দেহ গুটিকায় ভরা। আবিষ্কারের 27 বছরের মধ্যেই চিরতরে লুপ্ত হয়। মাংস, চর্বি এবং গুটিভরা চামড়া ব্যবহৃত হয় নৌকার আচ্ছাদন ও জুতোর জন্যে। জিয়র্গ স্টেলারের নামে নামকরণ হয় 'স্টেলারের সমুদ্র গাভী' (হাইড্রমালিস জাইগাস=হা· স্টেলারি।

অপর বংশ (ত্রিচেডিদি) মানাটির (ত্রিচেডাস মানাটাস) বাসস্থান দক্ষিণ-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র থেকে পশ্চিমে টেক্সাস, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশে আমাজন ও ওরিনকোর অববাহিকা ; পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাল নদী থেকে দক্ষিণে কুয়াঙ্গা নদীর মোহনা এবং চ্যাড হ্রদ থেকে প্রবাহিত নদীর খাঁড়ির মুখে। লোনা জল অপেক্ষা মিষ্টি জল পছন্দ করে বেশি। লম্বায় 2·5 থেকে 4·5 মি· ওজনে 40 কেজি থেকে 600 কেজি। চামড়া 5·1 সেমি পুরু। লেজের পাখনা গোলাকার। দেহকে প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে বাঁকাতে পারে। এরাও অবলুপ্তির পথে গিয়েছিল। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা রাষ্ট্রে ঘোষণা করা হয় মানাটিকে যে হত্যা করবে তাকে 500 ডলার ফাইন দিতে হবে। এর ফলে কিছুটা সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে।



নীলগাই

মে মাস 1940। শেষের দিকেই হবে। উত্তর বিহারের পুসায় আছি। আমাদের কাজের লোক রমজান, যে পশুপাখি দেখার ব্যাপারে নিত্যসঙ্গী ছিল, সে অনেক পশুপাখির চালচলন সম্বন্ধে জানত। তার কাছে অনেক কিছু শিখেও ছিলাম। একদিন সকালে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে গিয়েছি। রাস্তার ডানদিকে বেশ খানিকটা দূরে বুড়ি গণ্ডক বয়ে চলেছে। রাস্তা থেকে নদীর পাড় পর্যন্ত উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো জমি, ঝোপঝাড়, বড়ো বড়ো গাছপালা, অল্প ফাঁকা ঘাসজমিও আছে। হঠাৎ রমজান পথের মাঝে থেমে পড়ল। বেশ কিছু পায়ের ছাপ। বুড়ি গন্ডকের দিক থেকে এসে রাস্তা পার হয়ে বাঁদিকে ভুট্টা ও আখ খেতের দিকে নেমে গেছে। দেখে শুধু বুঝলাম যুগ্ম-খুর বর্গের (আরটিওডাকটাইলা) কোন প্রাণীর। বড়োসড়ো হরিণ জাতীয় হবে। আমার সন্দেহের কথা রমজানকে বলতে, সে মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকতে বলে, যেদিক দিয়ে পদচিহ্নগুলো এসেছে সেইদিকে রাস্তা থেকে নেমে চলল। আমিও ওর সঙ্গে ঝোপঝাড় ও গাছের আড়ালে আড়ালে খুব সন্তর্পণে চলেছি। আমরা অনেক চেষ্টা করলাম জন্তুটাকে দেখার কিন্তু একটিরও টিকি দেখতে পেলাম না! এক জায়গায় এসে

দেখি কোনো জন্তুর স্তূপীকৃত মল গাদা হয়ে আছে। মনে হল কাছেই আছে কিন্তু ঝোপঝাড়ের আড়ালে এমন নিঃশব্দে রয়েছে যে বোঝে কার সাধ্য। ভগ্ন মনোরথ হয়ে ফিরে রাস্তার উপর উঠতে উঠতে রমজান বলল, এক কিসিমের গরু। রোজরা, নীলগাও। ওরা এইরকমভাবে সবাই এক জায়গায় মলত্যাগ করে। মৃগদের এটা একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাই আমি ওকে বললাম, গাও নয়। একরকমের জীব, গরু আর হরিণের মাঝামাঝি। এদের বলা হয় মৃগ (অ্যাণ্টিলোপ)। আমার অজ্ঞতায় রমজান দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল। বলল, জরুর গাও আছে ঘোড়েকে মাফিক এবং আমাকে সে দেখাবেই।

পরদিন শেষ রাতে সেই পদচিহ্নের ধারে একটা মোটাসোটা মহুয়া গাছের উপর দুজনে চড়ে বসলাম। মহুয়া ফুলের গন্ধে জায়গাটা ম-ম করছে। কিছু ফুল ও ফল মাটিতে ঝরে পড়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। দূরে বুড়ি গণ্ডক নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। তখনও পূবের আকাশ লাল হয় নি। ছেপকা (নাইটজার) ও কোটরে পেঁচারা (স্পটেড আউলেট) থেকে থেকে ডাকছে, উড়ছে। আমাদের মাথার উপর ঘাপটি মেরে বসেছিল একটা লক্ষ্মী পেঁচা (বার্ন আউল) নিঃশব্দে ডানার পাখসাট মেরে উড়ে নেমে গেল ডানদিকে ঝোপঝাড়ের দিকে। আকাশ লাল হতে শুরু করেছে। সূর্য উঠব উঠব করছে। চারিদিক মোটামুটি বেশ দেখা যাচ্ছে। এমন সময় দেখতে পেলাম যেদিকে লক্ষ্মী পেঁচাটা উড়ে গিয়েছিল সেইদিক থেকে একটি-দুটি করে দশটি জীব, ঘোড়ার মতো দেখতে বেরিয়ে এল। তার মধ্যে তিনটির শিং আছে। বাকিদের শিং নেই। দলে দু-তিনটি অল্প বয়স্কও আছে। আস্তে আস্তে খুব সন্তর্পণে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে রাস্তার উপর আমাদের গাছতলাতে হাজির। যত মহুয়ার ফুলফল পড়েছিল সব খেয়ে শেষ করল। আমরা গাছের উপর লুকিয়ে বসে তাদের খাওয়ার শব্দ যেমন শুনলাম তেমনি তাদের পরিষ্কার ভাবে দেখতেও পেলাম। খাওয়া শেষ হলে তারা ধীরে ধীরে বাঁদিকে আখ-ভুট্টার খেতের দিকে নেমে গেল। তখন রোদের প্রথম আভা দেখা দিয়েছে। ওরা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে আমরাও গাছ থেকে নেমে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। প্রাণটা তখন চা চা করছে।

রোমন্থক নীলগাই (বসেলাফাস ট্রাগোকামেলাস) জোড়-খুর বর্গের অন্তর্গত গো বংশের (বভিদি) মৃগ শাখার (অ্যাণ্টিলোপিনি) এক প্রজাতি। ইং. ব্লু বুল, নীলগাই, হিন্দি রোজরা, নীল গাও। এই মৃগ উপবংশীয়দের না পারা যায় পুরোপুরো গরু-মহিষদের ভিতর ধরতে, না পারা যায় ছাগল-ভেড়ার

মধ্যে ফেলতে। জীববিজ্ঞানীরা বলেন, শুরুতে আদি রোমন্থক প্রাণী মৃগরা বিবর্তনের মাধ্যমে একটি ধারায় গরু-মহিষ এবং অপর একটি ধারায় ভেড়ারূপে উদ্ভূত হয়েছিল। এই কারণে বর্তমানের মৃগদের মধ্যে দুটি ধারার ছাপ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মৃগরা নানা আকৃতির হয়, তার মধ্যে নীলগাই সবচেয়ে আকারে বড়ো।

মাথা-দেহ 2 থেকে 2·1 মি, লেজ 456 থেকে 535 মিমি, লেজের শেষে কালো লোমের গুচ্ছ। উচ্চতায় পুরুষ 130-140 সেমি, কখনও 150 সেমি পর্যন্ত হতে দেখা যায়। স্ত্রী-জাতিরা আকারে একটু ছোটো। পুরুষের শিং গড়ে 20 সেমি, সবচেয়ে বড়ো শিং যা পাওয়া গেছে তা 29·8 সেমি। ওজনে পুরুষ প্রায় 200 কেজি। এই বড়ো সৌষ্টবহীন মৃগকুলের প্রাণীটির গঠন কিছুটা ঘোড়ার মতন। অংসফলক দুটির মাঝের সন্ধিস্থান ঘোড়ার মতই উঁচু এবং দেহের পশ্চাদভাগ নিচু। সেই কারণে সামনের পা বড়ো, পিছনের পা ছোটো। পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দেহ খসখসে লৌহ-ধূসর ছোটো লোমে ঢাকা, চারটি পায়ের খুরের উপয় সাদা লোমের আঙটি এবং দুগালে দুটি সাদা ছোপ। ঠোঁট, গলা, কানের ভিতর এবং লেজের তলা সাদা। অল্পবয়সী পুরুষ ও স্ত্রী-জাতির গায়ের রঙ হলদেটে পাটকিলে। স্ত্রী-পুরুষ দুজনের ঘাড়ে কালো কেশর। পুরুষের গলার প্রায় শেষে একগুচ্ছ কালো শক্ত লোম দাড়ির মতো ঝোলে। পুরুষের মাথার শিং ত্রিকোণাকার, খাঁজ কাটা ত্রিকোণ তলা থেকে গোল হয়ে উঠেছে। স্ত্রী-জাতির শিং হয় না।

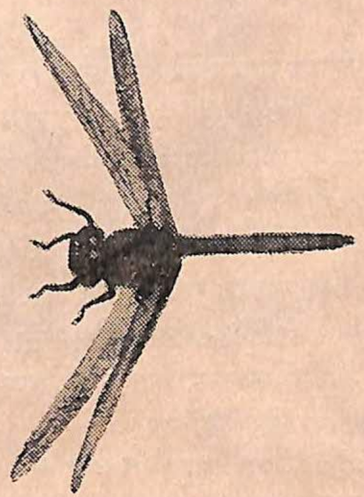
বাসস্থান—একমাত্র উপদ্বীপাত্মক ভারতে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে মহীশূর পর্যন্ত। বাংলাদেশ ও মালাবার উপকূলে দেখা যায় না। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির তত্ত্বাবধায়ক এস এস প্রেটার তাঁর বই 'দি বুক অফ ইন্ডিয়ান ম্যামালস'এ লিখেছেন আসাম-এ পাওয়া যায় না, কিন্তু আমার দুই খাসি শিকারী বন্ধু আইবর সেবং ও কেতু রায় গৌহাটি শিলং রোডে নংপোর পশ্চিমে মোটা বাঁশ ও ঘাসের জঙ্গলে বেশ কিছু দেখেছেন। তাঁদের বর্ণনায় ভুল পাইনি। হেসে জোর দিয়ে বলেছেন, ব্লু বুল-ই। ভুল হবার কোনো কারণ নেই।

খাদ্য—গাছপালার পাতা ও ছোটো শাখা টেনে ছিঁড়ে যেমন খায় তেমনি চরে ঘাসও খায়। যে কোনো চাষের খেতে ঢুকে তার সর্বনাশ করে। ভালোবাসে জংলী কুল ও শেয়াকুল এবং মহুয়ার ফুল ও ফল। জল পান না করে বহুক্ষণ

থাকতে পারে। প্রচণ্ড গরমেও খুব কম সময় জল পান করতে দেখা যায়। খায় খুব ভোর থেকে বেশ বেলা পর্যন্ত, তারপর গাছতলায় কখনসখনো বিশ্রাম। রোদের পরোয়া বিশেষ করে না, আবার বিকেল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খাদ্যসংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়।

স্বভাব—নীলগাই খুবই গভীর জঙ্গল এড়িয়ে চলে। দেখা যায় পাহাড়ী অঞ্চলে, উন্মুক্ত বা উঁচুনিচু ঢেউখেলানো জমিতে যেখানে প্রচুর ঘাস ঝোপঝাড় এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে গাছপালা আছে। মুখ দিয়ে বিপদসূচক একটা ঘোঁৎ শব্দ করে দলের সকলকে জানান দিয়ে মাথা উপরে দিকে তুলে যেন তারা গুণছে এমনিভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বেশ জোরে দৌড় দেয়। যে কোনো জমিতে এমন দ্রুত ছুটতে পারে যে দ্রুতগামী ঘোড়ার পক্ষেও ওদের ধরা শক্ত হয়ে পড়ে। ঘ্রাণ ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর কিন্তু শ্রবণশক্তি সেই অনুপাতে বেশ কম। সাধারণত 4 থেকে 10-এর দলে স্ত্রী-পুরুষকে একত্রে দেখা যায়। মাঝে মাঝে 10 বা তারও বেশির দলে একসঙ্গে বিচরণ করতে দেখা যায়। বয়স্ক পুরুষরা সাধারণত আলাদা বিচরণ করে, কখনও কখনও একসঙ্গে। বছরের যে কোনও সময়ে বাচ্চা হতে দেখা যায়। গর্ভধারণের সময় 8 থেকে 9 মাস। স্ত্রী-জাতি যৌনক্ষমতা লাভ করে 25 মাস বয়েসে।

ভারতের বহুস্থানের শিকারীরা নীলগাই মারেন না, কারণ গোমাতার নিকটতম জ্ঞাতি বলে পবিত্র মনে করেন।



গাঙফড়িং

একসময় মাছ ধরার খুব বাতিক ছিল। মাছ উঠুক বা না উঠুক চার ফেলে জল মেপে ফাতনাকে খাড়া রেখে জলের ধারে বসে থাকতে বড়ই ভালো লাগতো। চারে মাছ এসেছে, ফাতনায় চাপ পড়ছে, খুব মৃদু উঠছে নামছে, এবার ফাতনা ভাসবে কি ডুববে জানি না, এমনসময় একটা বড়োসড়ো ফড়িং এসে বসল ফাতনার উপরে। বিরক্তিতে মেজাজ খারাপ। আস্তে আস্তে জলে হাত ডুবিয়ে আঁচলা করে জল তুলে ছুঁড়ে মারি ফাতনার উপরে। ফড়িংটা উড়ে যায় পাশেই জলের উপরে মাথা উঁচু করা ঘাসগুলোর মধ্যে। বেশ কয়েকটা ফড়িং ওড়াওড়ি করছে। একটা এসে আবার বসে ফাতনার উপরে। একেবারে নাছোড়বান্দা। ফাতনার উপরে বসবেই।

এই ফড়িংকে বলি গাঙফড়িং (ড্র্যাগনফ্লাই)। পতঙ্গ গোষ্ঠীর অন্তর্গত এই গাঙফড়িংরা একমাত্র শীতপ্রধান দেশ ছাড়া বাকি সর্বত্র 500 গণে 5000-এর

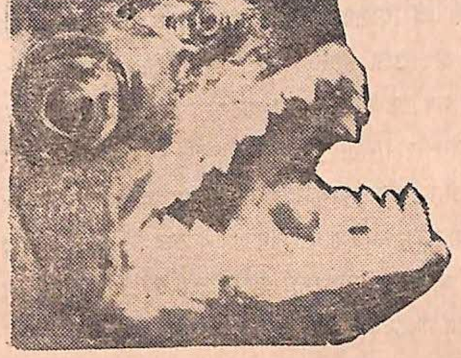
উপর প্রজাতিতে নানা রঙের দেহ নিয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। এদের জীবন শুরু হয় পুকুর জলা বিল হ্রদ ও স্রোতস্বতীতে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর মতই।

গাঙফড়িংয়ের লম্বা দেহ মাথা বুক (থ্যর‍্যাক্স) ও উদর নিয়ে গঠিত। প্রায় গোলাকার মাথায় দুটি বড়ো পুঞ্জাক্ষি এবং একজোড়া খুব ছোটো শুঙ্গ। মাথা যে কোনো দিকে ইচ্ছেমত ঘোরাতে পারে। মুখে আছে কামড়াবার ও চিবানোর অংশ। বুক ও উদরের বিভাজিত অংশগুলি একীভবন করা। মুখের পরেই বুকের দুপাশে তিনজোড়া পা। এই পা দিয়ে হাঁটতে পারে না কিন্তু খাদ্য ধরতে এবং যে কোনো জায়গায় বসতে পারে। বুকের দুপাশে জালিকরা ঝিল্লীময় দুজোড়া অসমান ডানা। এই ডানা কখনই মুড়তে পারে না, এমনকি বিশ্রামের সময়েও। সবসময়ে দেহের দুপাশের সঙ্গে সমকোণে থাকে। উদরের শেষাংশ বা লেজ সরু লম্বা এবং বিভাজিত।

স্ত্রী ডিম পাড়ে জলজ উদ্ভিদের গায়ে, জলের উপর ভাসমান কাঠের গুঁড়ি কিংবা জলের উপরেই এবং ডিমের পরিণতি ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

ডিম ফুটে যে বাচ্চা বার হয় তাকে 'নিম্ফ্' বলে। প্রাপ্তবয়স্কের চেহারার সঙ্গে কোনো মিল নেই। একেবারে সাধারণ জলজ পোকার মতো দেখতে। থাকে জলের ভিতরে কাদা বা পাঁকের মধ্যে। এই সময় মশার শুককীট, অন্যান্য পোকা ও ছোটো মাছ খেয়ে বড়ো হতে থাকে। এই নিম্ফ্দের আবার মাছেরাও খায়। বৃদ্ধির সঙ্গে বাইরের আবরণের নির্মোচন হয় অনেকবার। যখন বেশ বড়ো হয় তখন জল থেকে উঠে জলজ উদ্ভিদের গায়ে লেগে থাকে শেষ নির্মোচনের জন্য। তারপর ডানাসহ খোলস থেকে বেরিয়ে এসে উড়তে শুরু করে। পুকুরের পাড়ের কাছে এদের খোলস প্রায়ই দেখা যায়। ডিম থেকে পূর্ণরূপে পেতে একবছর কি তারও বেশি সময় নেয়। মার্চ-এপ্রিল থেকেই এদের দেখতে পাওয়া যায়। একমাত্র শীতকাল এদের দুঃখের দিন। সেই সময় এরা ঘন গাছের পাতা বা ঝোপের আড়ালে চুপচাপ পড়ে থাকে।

এদের খাদ্য মশা, ডাঁশ ও মানুষের অনিষ্টকারী অন্যান্য পোকা।



রাক্ষুসে পিরানহা

বহুদিন আগে প্রথম যৌবনে একটা সিনেমা দেখি, তার নামটা আজ মনে নেই, তবে তার মধ্যে একটা ঘটনা মনের মধ্যে তখন খুব নাড়া দেয়। ছবিতে দেখি একটি আহত গরু খুব কষ্টে দক্ষিণ আমেরিকার একটি নদী পার হচ্ছে। তারপর দেখা গেল মাত্র সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে তার কঙ্কালটা শুধু লোকে টেনে তুলছে। এক ঝাঁক ক্ষুরধার দাঁতওয়ালা ছোটো মাছ গরুটার ওই অবস্থা করে দেয়। মাছটার নাম জানলাম, 'পিরানহা'।

এরপর পিরানহাদের সম্বন্ধে জানবার খুব ইচ্ছে জাগে। বইপত্র খুঁজি। এক জায়গায় পড়লাম বলিভিয়ার কোনও নদীর ধারের এক সরাইখানার খাবার ঘরের অংশটি খুঁটি পুঁতে নদীর উপরে তৈরি। সেখানে ভ্রমণকারী পথিকদল ঔৎসুক্য প্রকাশ করলে এবং পয়সা দিলে একটা মরা শুয়োরকে দড়ি বেঁধে ঘরের মেঝের মধ্যে চোরা দরজা দিয়ে নদীর ভিতর নামিয়ে দেয়। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে টেনে তোলে শুধু শুয়োরটার কঙ্কাল। কী ভয়াবহ রাক্ষুসে মাছ!

পিটার ফ্লেমিং-এর বই 'ব্রাজিলিয়ান অ্যাডভেঞ্চার'-এ পড়লাম তিনি বেশ কয়েকবারই টাপিরাপে নদীতে জল ভেঙে চলেছেন আর দেখছেন কয়েক ফুট

দূরেই পিরানহার ঝাঁক। তাঁর কিন্তু কিছুই হয় নি। খুবই ভাগ্যবান পুরুষ বলতে হবে।

পিরানহাদের এই হিংস্রতা কিন্তু তাদের আবাসস্থলে সর্বত্র সমান নয়। ব্রিটিশ গিয়ানার অভ্যন্তরে বার্টিকা শহরের নদীতে সাঁতার কাটলে কিছুই হয় না। অথচ ওই নদীতে সাঁতারুদের পাশেই দেখা যায় বঁড়শি গেঁথে ছিপে লোকে ডজন ডজন পিরানহা তুলছে। কিন্তু কয়েক মাইল উপরের দিকে খুবই বিপজ্জনক। ওখানকার কুরানটাইন নদীর ধারের প্রত্যেকটি পুরুষ বাসিন্দার কারুর হাতের আঙুল, কারুর বা পায়ের, কারুর উরুর, কারুর হাতের উপর থেকে আধুলির আকারে মাংস যেন ছুরি দিয়ে কেটে নেওয়ার মতো করে কাটা। এসব হয়েছে স্নান করতে বা মাছ ধরতে গিয়ে।

স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মায়ার্স-এর (Myers) মতে 16 প্রজাতির পিরানহা যা সচরাচর দেখা যায় তারা তিনটি গণের মধ্যে সীমাবদ্ধ—বলিষ্ঠ, পেশীবহুল এবং ডিম্বাকৃতি। চারটি প্রজাতিই সবচেয়ে মারাত্মক। তার মধ্যে কালো আর লালের হিংস্রতার তুলনা নেই। এদের প্রত্যেকেরই ভোঁতা চোয়ালে ফাঁক ফাঁক ত্রিকোণাকৃতি কখনওবা একটু বাঁকা ক্ষুরধার দাঁতের সারি। দেহের দুপাশ ও পেট হয় রুপোলি না হয় গাঢ় ধূসর, পিঠ জলপাই-সবুজ বা নীলচে-কালো। কিছু প্রজাতির লালচে বা হলদেটে পাখনা। সাধারণত লম্বায় 6 থেকে 8 ইঞ্চি হয় কিন্তু কয়েকটি আবার দু'ফুট পর্যন্ত হয়। মাংস স্বাদহীন ছিবড়ে, সরু সরু কাঁটায় ভর্তি।

কলকাতার পশুশালার সামনে যে অ্যাকোরিয়াম, তাতে আছে দু'জাতের পিরানহা।

প্রজননকাল ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। ওই সময়টা ব্রাজিলের বর্ষাকাল। ডিম পাড়ে নদী থেকে একটু ভিতরে খাঁড়ির মধ্যে স্থির জলে, জলজ উদ্ভিদ বা নদীর পাড় থেকে জলে নেমে আসা শিকড়ের উপর। ডিম ফোটার পর জেলির মতো পোনারা ওইসব উদ্ভিদের গায়ে জড়াজড়ি করে লেগে থাকে যতদিন না পর্যন্ত নিজে সাঁতার দিতে পারছে। সাঁতারের অবস্থায় পোঁছোনোর আগে পর্যন্ত বাবা বা মা যে কেউ পাহারা দিয়ে থাকে।

ব্রাজিলের আমাজন নদীর পিরানহা নিয়ে অনেক রোমহর্ষক গল্প শোনা যায়। যেমন, নৌকা থেকে জলে আঙুল ডোবানোর সঙ্গে সঙ্গেই নাকি আঙুল

কেটে নেয়। পিরানহার খোঁজে আমাজন নদীতে যাবার দরকার পড়ে না। ব্রাজিলের যে কোনো বড়ো নদীতে এরা অজস্র। সাও ফ্রানসিসকো নদী যা ব্রাজিল শহরের কাছ থেকে বেরিয়ে অতলান্তিকে গিয়ে পড়েছে সেখানকার এবং পারাগুয়ের নদীর পিরানহারা সবচেয়ে বেশি হিংস্র। মৃত্যুর নদী মরটেস বা ব্রাজিলের আরাগুইয়া নদীর পিরানহাদের নিয়ে অনেক কথা শোনা যায়। সেখানকার মেয়েরা কিন্তু নিশ্চিন্তে জল নেমে কাপড় কাচে, তাদের কিছু হয় না। ওখানে লাল-সোনালি, সাদা এবং ভয়াবহ বড় আকারের কালো পিরানহাদের আড্ডা। দুর্ঘটনা ঘটে বটে, যেমন পথ চলতে গিয়ে মানুষের হয়ে থাকে। ওখানকার আধিবাসীরা জানে কোন সময়ে ওরা বিপজ্জনক। আহত বা কোনো কারণে রক্তক্ষরণ হওয়া অবস্থায় জলে নামলে আর রক্ষে নেই। এই সর্বগ্রাসী মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে হাজির হয়ে আক্রমণ করে। জলের উপর তাদের লাফালাফিতে মনে হয় জল যেন ফুটছে।

কাপড় কাচার সময় স্থানীয় মেয়েরা কেন আক্রান্ত হয় না সে সম্বন্ধে ব্রাজিলের সাও পাওলোর মুজিও পাওলিস্টার-এর প্রাণিবিদ হারাল্ড শুল্ৎজ বলেন, দেখা গেছে জলের উপর দুহাত দিয়ে থাপ্পর মারলে বা জলের একটু নিচে দু হাত দিয়ে হাততালি দিলে এবং জলের উপর কাপড় আছড়ালে এই মাছরা দূরে সরে যায়। আক্রমণ করে না।

খপ্পরে পেলে এই বিধ্বংসকারী মাছের হাত থেকে কোনো প্রাণীরই পরিত্রাণ নেই। নদীর ধারে বাসকারী তীক্ষ্ণদন্তী পাকা, জল শুয়োর ক্যাপিবরা, হাঁস ও অন্যান্য জলকুক্কুট, মাছরাঙা, পতঙ্গভোজী পাখি যারা জলের খুব কাছ দিয়ে ওড়ে এবং গুঞ্জনপক্ষি কেউই এদের আক্রমণ থেকে নিস্তার পায় না। জলের কাছঘেঁষা ওড়া পাখিদের জল থেকে লাফিয়ে উঠে ধরে জলের নিচে নিয়ে যায়। বড়ো আকারের টেপিরের গায়েও দেখা যায় এদের কামড়ের চিহ্ন। সেম্যান কুমিরও রেহাই পায় না। দেখা যায় বহু কুমির যারা আত্মরক্ষা করতে পেরেছে তাদের পায়ের আঙুল নেই। একমাত্র জব্দ পাখনা-লেজা ভোঁদড়ের কাছে, কারণ তারা পিরানহা মেরে খায়।

প্রাণিবিদ নিকোলাস গাম্পি ব্রিটিশ গিয়ানার এসাকিবো নদীতে নৌকো চেপে পার হবার সময় দেখেন তিন ফুট লম্বা এক মাছকে এদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে লম্বা লম্বা লম্ফ দিতে। শেষে আর না পেরে জলের

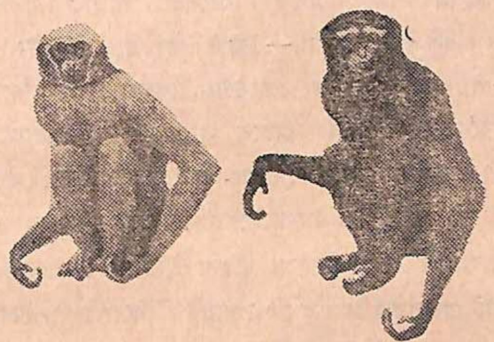
উপর ওলটপালট খেতে থাকে। উদ্ধার করতে কাছে গিয়ে দেখেন প্রায় এক ডজন ছোটো জাতের পিরানহা মাছটার মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে। জল থেকে তুলতে গিয়ে দেখেন মাছটি ইতোমধ্যে প্রাণ হারিয়েছে।

পিরানহা বেশিরভাগ সময়ে জলের তলার দিকে থাকে। তারা সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় তাদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিবারণের জন্য। পছন্দ করে শান্ত গভীর জল, গাছপালা বা পাথরের ছায়ায় এবং ছায়াঘেরা বালির পাড়ে যেখানে জল ঘূর্ণি খায়।



লাল পরানহা

যদি কারুর আমাজন বা তার শাখা-উপশাখায় নামার সৌভাগ্য হয় তাহলে তার পায়ে অনুভব করবে হাজারে হাজারে খুব ছোটো পুঁটি মাছের মতো মাছ 'একসোডন পারাডোকসাস' কুট কুট করে কামড়াবার চেষ্টা করছে। পরিত্রাহী চীৎকার করে জল থেকে লাফিয়ে উঠে আসার প্রয়োজন নেই, কারণ তাদের দাঁতের গঠন পিরানহার মতো হলেও এত ছোটো যে কামড় বসাতে পারে না।



উল্লুক

প্রকৃতির মাঝে মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় এই জন্তুটিকে দেখার জন্যে ঘুরেছি। ডাক শোনা ছাড়া চোখে দেখার সৌভাগ্য হয় নি। সমগ্র ভারতে একমাত্র আসামেই এই জন্তুকে দেখা যায়, আর কোথাও নয়। অবশ্য চিড়িয়াখানা এদের আমরা দেখে থাকি। ব্যক্তিগত সংগ্রহেও দেখেছি।

এক বিদেশী দম্পতির সঙ্গে একসময় পরিচয় হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন পশুপক্ষী প্রেমিক। তাঁরা সিঙ্গাপুরে থাকার সময় এদের একজোড়াকে পুষেছিলেন। দেশে ফেরার পথে কলকাতা হয়ে যাবার সময় আলাপ হয়েছিল। এই জোড়াটি তাঁদের খুবই অনুগত ছিল।

পুরুষটি ছিল ভয়ানক ঈর্ষাপরায়ণ। ভদ্রমহিলাটির সঙ্গে কথা বলতে গেলেই অস্থির হয়ে উঠত। লাফালাফি ও পাগলামি শুরু হয়ে যেত। কিছুতেই কথা বলতে দেবে না, আমাকে আক্রমণ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠত। যেই তিনি শিকল দেখিয়ে বলতেন, বেঁধে রাখব। অমনি কোলের উপর চেপে গলা জড়িয়ে বসত, যেন কত ভালোমানুষটি। আর আমাদের কথা বলার মাঝে থেকে থেকে ঝট করে তার মস্ত লম্বা হাত কিংবা লম্বা পা আমার দিকে চালাতো।

এই জানোয়ারা হল শ্রেষ্ঠী বর্গের (প্রাইমেটস্) অন্তর্গত বনমানুষ অর্থাৎ মানবসদৃশ লেজহীন বানর (এপস্) বংশের (পঙ্গিডি) বৃক্ষবাসী গণের (হাইলোব্যাটিস) এক প্রজাতি, নাম—উল্লুক (হা· হুলুক), ইং· গিবন।

বাসস্থান—পৃথিবীতে উল্লুক, ওরাংউটান, শিম্পাঞ্জি ও গরিলা এই চার জাতের বনমানুষকেই দেখা যায়। ভারতে পাওয়া যায় একমাত্র উল্লুককেই আসামের জঙ্গলে ও ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাংশে, লোহিত ও ডিবাং নদীর ধার ধরে বর্মার সালউইন নদী পর্যন্ত এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ থেকে শুরু করে উত্তর বর্মা ও উত্তর শানরাজ্য দক্ষিণ ইউনানে। ভারত থেকে দূর প্রাচ্যের মধ্যে ছটি প্রজাতির উল্লুক দেখা যায়। বিদেশী দম্পতির ছিল অন্য এক প্রজাতির (হা· লার)। এই প্রজাতির হাত-পা দুইই সাদাটে হয়।

উল্লুক খাড়া হয়ে দাঁড়ালে মেরেকেটে উচ্চতায় হয় 90 সেমি। কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি মাপলে যতটা লম্বা হয় হাত দুটি লম্বায় তার ডবলেরও বেশি। পুরুষ এবং অলপবয়সী স্ত্রী-জাতির রঙ কালো, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ থেকে ছ বছরের ভিতরে স্ত্রী-জাতির কালো রঙ ফিকে হয়ে হলদেটে ধূসর হয়। পুরুষের কালো দেহে চোখের উপর সাদা চওড়া ভুরু। ওজনে 6 থেকে 8 কেজি।

খাদ্য—ফল, গাছের পাতা, নানারকম কীটপতঙ্গ, মাকড়সা, ছোটো ছোটো পাখি ও ডিম। গাছের পাতার উপর ঝরে পড়া শিশির চেটে কিংবা তাদের দুহাত আঁজলা করে শিশির নিয়ে পান করে।

স্বভাব—পাহাড়ী জঙ্গলের গাছে গাছেই এরা কাটায়। মাটিতে নামে খুব কম। খাড়া হয়ে হাঁটে যখন, তখন দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে মাতালের মতো টলমল করতে করতে ভারসাম্য বজায় রাখে। সাধারণত এক পরিবার অন্য পরিবারের সঙ্গে মেশে না। এক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ছটির বেশি দেখা খুব কমই যায়।

প্রত্যেক পরিবার তার সীমাবদ্ধ নিজস্ব এলাকার মধ্যেই খাদ্যসংগ্রহ করে। এক পরিবারের সর্বোচ্চ এলাকা দেখা গেছে 12,720 মিটার। গাছের মাথায় প্রতিদিন একই পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করার দরুন একটা সুস্পষ্ট চিহ্ন তৈরি হয়।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে কিংবা একটু রোদ উঠলে ওরা 'হুক্ হুক্' করে ডাকতে আরম্ভ করে। গোড়ায় শুরু করে একজন তারপর পরিবারের একে একে

সকলেই। এক পরিবার অন্য পরিবারকে এমনিভাবে জানান দেয়। তার ফলে সমস্ত বন তাদের হুকুরবে মুখর হয়ে ওঠে। রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুপুর হবার একটু আগে থেকেই এরা ছায়াঘেরা জায়গায় আত্মগোপন করে বিশ্রাম নেয়। তখন একদম চুপ। রোদ পড়লেই আবার খাদ্যসংগ্রহে মনোযোগী হয়। এবং ডাকতে থাকে। তবে এই ডাকে তত জোর নেই। রাত্রে পাশাপাশি গা ঘেঁষে সোজা হয়ে বসেই ঘুময়।

গাছে গাছে ঝুলে লাফিয়ে এত সাবলীলভাবে চলাফেরা আর অন্য কোনো জাতের বনমানুষের মধ্যে দেখা যায় না। সাধারণত এক ডাল থেকে আর-এক ডালে লাফিয়ে চলে 3 মিটারের মতো তফাতে। এক গাছ থেকে আর-এক গাছে লাফিয়ে যেতে 9 মিটার কি তারও বেশি দূরত্ব দেখা গেছে।

একটি সঙ্গিনীকে নিয়েই জীবন কাটায়। সঙ্গিনীকে ডিভোর্স বা পরিত্যাগ করে অন্য কাউকে নির্বাচন করে কিনা তা এখনও জানা যায় নি। আর জানা যায় না কিভাবে এদের এক-একটি পরিবার গঠিত হয়।

6 থেকে 10 বছর বয়েসের ভিতর যৌনক্ষমতা লাভ করে। তখন হয় পারিবারিক দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, না হয় নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে পরিবারের কাছাকাছি থাকে। সঙ্গিনী জোটাতে পারলে অর্থাৎ কোনও কুমারীকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলে নিজস্ব সংসার হওয়ার সঙ্গে নিজস্ব খাদ্যএলাকাও তৈরি করে।

প্রজননকাল বর্ষার শুরুতে এবং 200 থেকে 212 দিন গর্ভধারণ করে ডিসেম্বর থেকে মার্চের ভিতর একটিমাত্র সন্তান প্রসব করে। মা-উল্লুক সন্তানকে পিঠে নিয়ে বা একহাতে জড়িয়ে ধরে বিনা আয়াসে এক ডাল থেকে আর-এক ডালে লাফিয়ে বেড়ায়। বন্দী অবস্থায় দেখা গেছে 23 থেকে 25 বছর বাঁচতে।



গুলবাঘ

এই প্রাণীটি অত্যন্ত চতুর, হিংস্র এবং খল স্বভাবের। জিম করবেট তাঁর বইতে খুব ভালোভাবেই এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির পরিবেশে মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় আমার কখনই এর সঙ্গে মোকাবিলা হয় নি। অল্পের জন্যে দেখা হয়ে উঠল না গত 4.1.84তেও। বন্ধু শিকারীদের সঙ্গে থেকেও জীবিত অবস্থায় দেখতে পাই নি। দেখেছি পায়ের ছাপ আর শিকারের পর মাপজোখ এবং ছাল ছাড়িয়ে নেবার সময় শব ব্যবচ্ছেদে তদারকি করেছি।

জীবটি বিড়াল বংশীয় (ফেলিদি), নাম— গুলবাঘ, চিতাবাঘ, সোনা চিতা, তেন্ডুয়া (প্যান্থেরা পারডাস), ইং. লেপার্ড, প্যান্থার।

গুলবাঘ গড়ে লম্বায় 215 সেমি, স্ত্রী-জাতি একটু ছোটো 30 সেমি কম। কখনোসখন পুরুষকে 245 সেমি পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা যায়। সাধারণ ওজন 52 কেজি পুরুষ, 39 কেজি স্ত্রী। বড়োর ওজন— পুরুষ 68 কেজি, স্ত্রী প্রায় 50 কেজি। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানা আকারের ও ওজনের দেখা যায়। সাধারণত দেহ লালচে-হলুদ নরম মসৃণ ছোটো ছোটো লোমে ভরা চামড়ার উপর ছোটোবড় গুলের (rosette) ছাপে ভরা। দেহের রঙের তারতম্যও বিভিন্ন

রকম। যেমন, কাশ্মীরে নরম ঘন লোম, ধূসরাভ ঈষৎ হলুদ চামড়ার উপর বেশ ছোটো আকারের গুলের চাকা যার ধারগুলো চওড়া। সিকিম ও নেপালে একটু রঙের তফাত দেখা যায়। কেরালার নেল্লিয়ামপাড়ি পাহাড়বাসীদের রঙ কালচে এবং আকারে ছোটো।

বাসস্থান—পাকিস্তান, সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও বর্মা। বিশ দশকের শেষে ও ত্রিশের গোড়াতেও কলকাতার কাছে মধ্যমগ্রাম ও বাদুর মধ্যে পায়ের ছাপ দেখেছি।

খাদ্য—গরু-বাছুর, হরিণ, বাঁদর, কুকুর ইত্যাদি ছোটো জন্তু ও শজারু। প্রয়োজনে পাখি সরীসৃপ ও কাঁকড়া। নরখাদক হলে বাঘের চেয়ে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

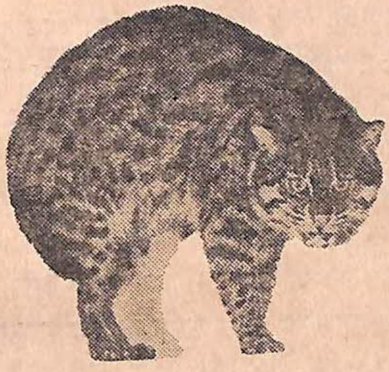
স্বভাব—গুলবাঘ ভারতের যে কোনও স্থানে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। বাঘেদের মতো কেবল ঘন জঙ্গলেরই প্রয়োজন হয় না। এরা জঙ্গলে যেমন তেমনি উন্মুক্ত পাথুরে জমিতে বা ঝোপঝাড়ের মাঝেও মহানন্দে বাস করে। বাঘ যেমন কড়া রোদ পছন্দ করে না, এদের সেসব বালাই নেই। রোদে কিছুমাত্র অসুবিধে বোধ না করার দরুন প্রায়ই দেখা যায় রাতে শিকার সংগ্রহ করতে না পারলে দিনে করেছে। বিনা বাধায় যে কোনও ছোটোবড় জন্তু অবলীলাক্রমে শিকার করে। বড়ো সম্বর, বারশিঙ্গা, বড়ো পুরুষ নীলগাইদের ঘাঁটায় না। এদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু বাঘ। জঙ্গলের ঠিক বাইরে মানুষের বসতির কাছাকাছি যারা থাকে তাদের বাঘের সঙ্গে সংঘর্ষ হবার বিশেষ কারণ ঘটে না। জঙ্গলেও পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। গভীর জঙ্গলের বাসিন্দাদের গতিবিধি বাঘের মতো। জানোয়ারদের পথ চলার পথে হয় একটু লুকিয়ে থেকে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, না হয় গাছে চড়ে ঝুলে থাকা ডালে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করে, নিচ দিয়ে শিকার গেলে উপর থেকে লাফিয়ে ঘাড়ে পড়ে। গুল-বাঘের শক্তি অসম্ভব। শিকারকে ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে রাখার অসুবিধা হলে গাছের উপর টেনে তোলে। দেখা গেছে পুরুষ চিতলকে মুখে করে গাছের উপর টেনে তুলতে। গাঁয়ের ধারের বাসিন্দারা মানুষের রীতিনীতি এত ভালো জানে যে একবার নরখাদক হলে বাঘের চেয়ে অনেক বেশি তৎপর ও মারাত্মক হয়ে ওঠে। বছরের যে কোনো সময়ে সন্তান প্রসব করে। বন্দী অবস্থায় দেখা গেছে

প্রথম সন্তান হয় আড়াই থেকে চার বছর বয়সের মধ্যে। গর্ভধারণ কাল 87 থেকে 94 দিন। সাধারণত দুটি শাবকই জন্মায় কিন্তু 3-4টি হতেও দেখা যায়। চোখ ফোটে জন্মাবার 4 থেকে 8 দিনের মধ্যে। চার মাস পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধে পালিত হয়।

আদিবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস জঙ্গলের অনেক মানুষই 'বুড়কাল' অর্থাৎ গুল-বাঘের রূপ ইচ্ছেমতো ধরতে এবং আবার স্বরূপে ফিরে আসতে পারে। এক জংলী গোনদ বুড়ো রাতের অন্ধকারে গভীর জঙ্গলের ভিতর আগুনের সামনে বসে বলেছিল, একদিন এক গুণীন তার স্ত্রীকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছে স্ত্রীর বাপের বাড়ি। জঙ্গলের মধ্যে এক ফাঁকা জায়গার কিনারায় এসে দেখে অদূরে কয়েকটা নীলগাই চরছে। নীলগাই দেখে স্ত্রীর বড়ো মাংস খাবার ইচ্ছে হয়। বারবার বলতে থাকে একটাকে মারতে। তাহলে বেশ আগুনে ঝলসে খাওয়া যাবে। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে গুণীন তার ঝোলা থেকে একটা শিকড় বার করে বলল, এইটে হাতে রাখ। শিকার করে ফিরে আসার পর তখন এটাকে আমার নাকের কাছে ধরে শুঁকিয়ো। এই বলে মন্ত্র পড়তে পড়তে বুড়কাল হয়ে নীলগাইদের মধ্যে একটা ছোটো মতনকে মেরে টানতে টানতে নিয়ে এল। তার ঐ রক্তমাখা মুখ ও হিংস্র কুটিল ভঙ্গি দেখে স্ত্রীটি ভয়ে হাতের শিকড় ঝোপের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে পিছন ফিরে চিৎকার করতে করতে দিল ছুট। বুড়কাল হওয়া গুণীন ঝোপঝাড়ের মধ্যে অনেক খুঁজেও শিকড়টাকে পেল না। তখন রাগে স্ত্রীর পিছনে ধাওয়া করে তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। এরপর সে মানুষ দেখলেই মারতে শুরু করে। সব যে খায় তা নয়। হত্যার আনন্দেই হত্যা। শিশু-বুড়ো জোয়ান-কিশোর ছেলেমেয়ে বাদ কেউ নেই। বিশেষত মাচানের উপর পাহারারত বা ঘরে ঘুমিয়ে থাকা লোককেই মারতো বেশি।

নাটকীয় ভঙ্গীতে এই পর্যন্ত বলে সে উঠে একটু আড়ালে গেল। পরিবেশটা এমন হয়ে উঠল যে অজ্ঞাতসারে গুলিভরা বন্দুকের সেফটি আপনা থেকেই সরে গেল। ভিতরে সতর্কতার সঙ্গে একটা চাপা উত্তেজনা। বুড়ো ফিরে এল একটু বাদে সশরীরে। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এসেই বলল, ভাবছেন গাঁয়ে কোনো শিকারী ছিল না? ছিল কিন্তু এতো বুড়কাল। কে এর পিছনে যাবে? মারা পড়েছিল তিনবছর বাদে।

গল্প বাদ দিয়ে গুলবাঘ যে বাঘের চেয়ে কত হিংস্র ও চতুর এতে সেটাই প্রমাণিত হয়।



বাঘডাশা

দ্বারভাঙা জেলার পুসায় কদিন আছি। আমাদের কাজের লোক রমজানকে নিয়ে বুড়ি গণ্ডকের ধার দিয়ে ফিরছি, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, গোধূলির আলো তখনও মিলয় নি, চোখে পড়ল বেশ বড়োসড়ো বিড়াল জাতীয় একটা জন্তু জলের ধার ঘেঁষে একটা পাথরের উপর ওতপেতে বসে আছে। জন্তুটাকে আগে একবার দুবার দেখেছি বনগাঁর কাছে চাঁদপাড়ায় আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মজিলপুরে। জানি হাঁস, মুরগী, ছোটো পাখি, ছাগল-কুকুর ছানা ইত্যাদি খাবার যম বলে। তাকে দূর থেকে জলের একদম ধারে অমন করে বসে থাকতে দেখে আমরা আড়াল থেকে নজর রাখলাম।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ জলের উপর আচমকা এক থাবা মেরে পাড়ের উপর ছিটকে ফেলল একটা মাছ। নিমেষের মধ্যে মাছটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাগিয়ে এনে মিনিট খানেকের মধ্যে পরম তৃপ্তিতে উদরসাৎ করল। তারপর জলের ধারে আবার গিয়ে ওতপেতে বসল। ঘরে ফেরার তাড়া ছিল এবং অন্ধকারও নেমে এসেছে বলে আর মাছ শিকার করল কিনা তা দেখা হল না।

পরে কলকাতায় ফিরে বইপত্তর ঘেঁটে জানলাম, জন্তুটার নাম—বাঘডাশা, বাঘেলা, মেছো বিড়াল (ফেলিস ভিভেরিনা), ইং. টাইগার ক্যাট, ফিশিং ক্যাট।

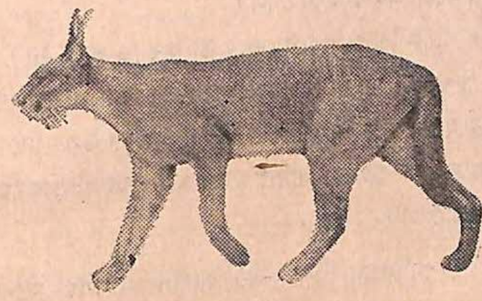
বাঘডাশা বা মেছো বিড়াল দেহ-মাথা নিয়ে 100 সেমি, লেজ প্রায় 30 সেমি, ওজনে 11 থেকে 15 কেজি। চিতা বা বন বিড়ালের (লেপার্ড ক্যাট) প্রায় ডবল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছোটো কিন্তু শারীরিক গঠনে রীতিমত গাঁট্টাগোট্টা। দেহে খসখসে ছোটো মেটে-ধূসরের সঙ্গে পাটকিলের আভা মেশানো লোম। দেহে বহু লম্বাটে ধরনের ছোপ। সেই ছোপ নানা ধরনের এবং দেখা যায় কারও সঙ্গে কারও ছোপের প্যাটার্ন মেলে না। 6 থেকে 8টি গাঢ় রেখার লাইন কপাল থেকে মাথার চাঁদি পার হয়ে ঘাড়ের কাছে এসে ভেঙে গিয়ে ঘাড়ের উপর ছোটো ছোটো টুকরো ও ছোপে পরিণত হয়েছে। গাল ধূসরাভ সাদা, তার উপর দুটি আনুভূমিক কালো বা পাটকিলে ডোরা। চার পায়ের উপর দাগ হলে খুবই অস্পষ্ট, না হলে নেই। সামনের দুই পায়ে দুটো করে আড়াআড়ি কালো টান। দেহের তলায় অর্থাৎ বুক-পেটে ছিট এবং লেজে কতকগুলো কালো আঙটির ঘের। সামনের দুটি পা বেশ সুস্পষ্ট এবং নখরকোষ খুব বড়ো না হওয়াতে নখর কিছুটা বেরিয়ে থাকে।

বাসস্থান—হিমালয়ের 1525 মিটার উচ্চতার ভিতর এবং পাদদেশের জলাভূমি, পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ, বাংলাদেশ, ওড়িশার কিছু অংশ বিশেষত চিল্কা হ্রদের আশপাশ, উত্তর প্রদেশ, পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ, ভারতের পশ্চিম উপকূলে ম্যাঙ্গালোর থেকে কন্যাকুমারিকা, শ্রীলঙ্কা, এবং ইন্দোনেশীয় অঞ্চলে।

স্বভাব—বাঘডাশা গভীর জঙ্গল বা তার কিনারায় গুল্মের ভিতর, নলখাগড়ার ঝোপ, নদী এবং জোয়ারভাটা খেলে এমন খাড়ির ধারে বাস করে। মাছ তার খাদ্য হলেও কখনও জলে নেমে শিকার ধরে না। যে কোনো পশুপাখি যা সে শিকার করতে পারে তাই তার খাদ্যের মধ্যে গণ্য। বাছুর, ভেড়া, কুকুর এমনকি ছোটো শিশুও তার আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় না। স্বভাবে অসম্ভব হিংস্র। এমন ঘটনার কথাও নথিভুক্ত আছে যে একবার সদ্য ধরা পুরুষ বাঘডাশাকে কাঠের পার্টিশন দেওয়া এক বড়ো খাঁচায় একটি পোষা স্ত্রী-গুলবাঘের পাশে রাখা হয়েছিল। বাঘডাশাটি তার চেয়ে দ্বিগুণ বুড়ো গুলবাঘটিকে পার্টিশন ভেঙে মেরে ফেলেছিল, কিন্তু তার দেহের কোনো অংশ সে খায় নি।

বড়ো অবস্থায় ধরে কেউই কখনও পোষ মানাতে পারে নি। শোনা যায়, শিশু বাঘডাশাকে পোষ মানানো সম্ভব।

মেছো বিড়াল নামটি আমার কাছে প্রযোজ্য বলে মনে হয় না, কারণ মাছের চেয়ে খাদ্যবিচারে অন্যান্য পশুপাখি শিকার করে খাওয়াটাই এদের প্রিয়।



সিয়াগোশ

শিলং-এ লাবান পাড়ায় আছি। 1947 সাল। যে বাড়িতে আছি তার সামনে দিয়ে রাস্তা উঠে গেছে লাবান পাহাড়ের মাথায়। একদিন খুব ভোরে তখনও রোদ ওঠে নি, আলো থাকলেও পাহাড়ের মাথায় গাছগুলির ফাঁক দিয়ে রোদের ছটা এসে ঝিলমিল করে নি। জঙ্গলকে অনুভব করে ঝিঁঝিঁপোকার তানপুরার আওয়াজ শুনতে শুনতে মর্নিং ওয়াক-এ চলেছি। উদ্দেশ্য পাহাড়ের উপর দিয়ে সেরি-কালচার ফার্ম বা রেশম কীটের আবাদ ভূমিতে নামার।

প্রায় নেমে এসেছি এমনসময় চোখে পড়ল একটা জন্তু। সে আমার চোখের আড়ালে আড়ালে চলছিল, হঠাৎ দাঁড়িয়েপড়ে আমার দিকে ফিরল। ওকে আগে লক্ষ্য করি নি। আমার থেকে কুড়ি-পঁচিশ হাত দূর দিয়ে সামনেই চলছিল অতি নিঃশব্দে। এখন দেখতে পেলাম। পাতলা ছিপছিপে চেহারায় বড়ো বড়ো দুই গভীর চোখ। খাড়া কান দুটোর বাইরেটা কালো, ভিতরটা সাদা। খাড়া কানের উপর খাড়া হয়ে আছে কয়েকটি চুলের গুচ্ছ। মুখটা বিড়াল বংশীয়দের (ফেলিদ) মতো। দেহের রঙ উপরে লালচে বালি, তলাটা সাদাটে। লম্বাটে লেজের রঙ উপরের দেহের মতো, ডগাটা কালো। উপরের ঠোঁটে কালচে ছোপ, চোখের উপরেও তাই। নাকের দুপাশে সরু কালো লাইন নেমে এসেছে। পা লম্বাটে, পিছনের পা সামনের চেয়ে বড়ো।

মিনিট দুই পরস্পর পরস্পরকে দেখলাম। তারপর সে মাথা ঘুরিয়ে বাঁদিকের ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এভাবে এই জন্তুকে শিলং শহরে দেখব তা কখনও ভাবি নি। এর দুদিন পরেই আবার দেখলাম সেরি-কালচার ফার্মের ভিতর পাথরের উপর পা দিয়ে দিয়ে ডিঙিয়ে একটা পার্বত্য নালা পার হয়ে পাহাড়ের উপর দিকে উঠবার সময় একজোড়াকে নেমে আসতে। আমায় দেখে খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে বেশ দ্রুত বেগে আড়ালে চলে গেল।

খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, শিলং-এর লাবান অঞ্চলের অনেক বাসিন্দাই দেখেছেন। এমনকি সেরি-কালচার ফার্ম ছাড়িয়ে চাঁদমারির কাছেও।

জন্তুটা আমার অচেনা নয়। কলকাতার চিড়িয়াখানায় আগেই দেখেছিলাম। কিন্তু প্রকৃতির আঙিনায় কখনও দেখব বলে ভাবি নি। নাম—সিয়াগোশ (ফেলিস কারাকাল), ইং. ক্যারাকাল। সিয়াগোশ পারস্য দেশীয় নাম, যার অর্থ কালো কান। দেহ-মাথা 60 সেমি, লেজ প্রায় 23 সেমি। উচ্চতায় 41-45 সেমি। ওজনে 7-8 কেজি।

বাসস্থান—একমাত্র রবার্ট এ স্টার্নডেল-এর 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি অব দি ম্যামালিয়া অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড সিলোন' (1884) ছাড়া আর কোনও বইতে আসাম বাসস্থান বলে উল্লেখ নেই। উল্লেখ আছে বেলুচিস্তান, সিন্ধু, কচ্ছ (উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম পর্বতে বেশি), পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যভারতের শুষ্ক ভূমিতে বাসস্থান বলে। ভারতের বাইরে ইরাক, ইরান, আরব এবং আফ্রিকার বহুস্থানে।

খাদ্য—পাখি যা ওড়ার মুখে ঝাঁপিয়ে ধরে, ইঁদুর খরগোশ অর্থাৎ তীক্ষ্দন্ত (রোডেন্টস্) জাতীয় জীব, চিংকারা মৃগ (ইন্ডিয়ান গ্যাজেল) এবং ছোটো হরিণ।

স্বভাব—সিয়াগোশ আজ অবলুপ্তির পথে। এদের বন্য জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

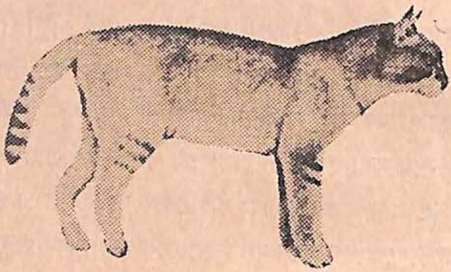
শিকারী চিতার (আকিনোনাইকস্ জুবাটাস) মতো একসময় সিয়াগোশকেও পোষ মানিয়ে শিকার ধরানো হতো। তারা শিকার করত ছোটো হরিণ, চিঙ্কারা, খরগোস, শেয়াল, ময়ূর, সারস ও পায়রা। অদ্ভুত সাবলীলতার সঙ্গে চোখ ও পায়ের কাজে এমন সামঞ্জস্য আর কোনো জন্তুর মধ্যে দেখা যায় না। নথিভুক্ত

আছে, দানা খুঁটে খাচ্ছে এক ঝাঁক পায়রার মধ্যে এক শিক্ষিত সিয়াগোশকে ছাড়া হয়েছিল, দেখা গেল নিমেষের মধ্যে পা চালিয়ে 9-10 টাকে মেরে ফেলেছে। বিড়াল বংশীয়দের (ফেলিদি) মধ্যে এরাই একমাত্র শিকারী চিতার কিছুটা কাছাকাছি আসতে পারে, যদিও শিকারী চিতার মতো অত গতি ও দম নেই।

ভারতে এদের প্রজননকালীন আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কিছুই জানা যায় নি। মনে করা হয় শজারুর গর্ত, গাছের গোড়ার ফোকর বা পাথরের খোঁদলে এদের সন্তানরা জন্মায় এবং দুই থেকে চারটি বাচ্চা প্রসব করে থাকে। 1980 সালের অক্টোবরে রাজস্থানে দুটি বাচ্চাকে সংগ্রহ করা হয়েছিল।

এদেরই এক জাতভাই আকারে বেশ বড়ো ও রোমশ জন্তুকে দেখা যায় সিন্ধু উপত্যকার উচ্চভূমি, গিলগিট, লাডাখ এবং তিব্বতে। কাশ্মীরিরা বলে 'পাটসালাম' (ফেলিস লিংকস্), ইং. লিঙ্কস্।

প্রকৃতির পরিবেশে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। এদের দেহ-মাথা 85-90 সেমি, লেজ 18-23 সেমি, ওজনে 27 কেজি। সিয়াগোশের চেয়ে পাটসালামের লেজ ছোটো। এদের কানের উপরও খাড়া চুলের গুচ্ছ কিন্তু দেহের রঙ বালি-ধূসর ও রোমশ। গ্রীষ্মে লোমশ দেহে যে গোল ছোটো ছোপ দেখা যায় তা শীতে আর দেখা যায় না। গ্রীষ্মে এদের বিচরণক্ষেত্র 2745 থেকে 3355 মিটার উচ্চতার মধ্যেই। শিকার করে খরগোস ও বিভিন্ন তীক্ষ্নদন্তী জীব, পার্বত্য ভেড়া-ছাগল, তিতির ও জীবঞ্জীব (ফেজাণ্টস্)। এদের প্রজননকালীন আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও কিছুই বিশেষ জানা যায় নি। তবে মনে করা হয় গ্রীষ্মে 2-3টি শাবক প্রসব করে।



খাটাশ

বরানগরে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে আমার অফিস ছিল তখন 206 নং ব্যারাকপুর ট্র্যাঙ্ক রোডে। পুকুর সহ নানারকম ফলের বড়ো বড়ো গাছপালায় ছিল বাগানবাড়িটা ভর্তি।

একদিন আমার ঘরে বসে কাজ করছি। এমন সময় এক কর্মী এসে বললেন, স্যার, এইমাত্র রাস্তা পার হয়ে ওপার থেকে একটা বাঘের বাচ্চা এসে গাছে চড়েছে।

বাঘ ? বাঘের বাচ্চা ? তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে ? না স্যার, স্পষ্ট দেখেছি দৌড়ে এসে গাছে চড়তে। বলি, চল দেখি কোথায় তোমাদের বাঘের বাচ্চা। কাজকম্ম নেই, যতসব হুজুগ। দেখছি আমি কোন্ গাছে ? তারা আমাকে একটা কলমের ঝাঁকড়া আমগাছ দেখায়। তাদের ওখানে দাঁড়াতে বলে আমি এগোই। কর্মীরা সমস্বরে বলে ওঠেন, না না যাবেন না, ওপর থেকে বড়বাবুর দোনলা বন্দুকটা নিয়ে আসি, সেটা নিয়ে যান স্যার। বললাম, না ওসব কিছুই লাগবে না। বাঘ বা গুলবাঘ কোনো কিছুই হতে পারে না। কি দেখতে কি দেখেছ।

আস্তে আস্তে গাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কাণ্ড যেখানে শেষ হয়েছে তার মাঝে দুই ডালের ফাঁকে পা ঝুলিয়ে বসে আছে সে বাঘের মতই, তবে আকারে খুবই ছোটো। বালি-ধূসর দেহের এক জানোয়ার। লেজটা ঝুলছে,

তার গায়ে কালো কালো গোল আঙটির মতো ছোপ, ডগা সম্পূর্ণ কালো। নিষ্প্রভ সবুজ চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সেই চাউনি আমি জীবনে ভুলব না। নিস্পৃহ নিষ্পলক অপার্থিব শীতল এক চাউনি। আমার শরীর কেঁপে উঠল। নিজেকে আত্মস্থ করতে একটু সময় লাগল। আমি ধীরে ধীরে ওখান থেকে সরে এসে সকলকে আশ্বস্ত করলাম।

হ্যাঁ, জন্তুটা বাঘ পরিবারেরই এক জাতি। নাম—খাটাশ, জংলী বিড়াল (ফেলিস চাউস), ইং. জাংগল ক্যাট।

খাটাশের দেহ-মাথা 60 সেমির কিছু উপরে, লেজ 30 সেমির মতো, ওজনে 5-6 কেজি। পা লম্বাটে, দেহের তুলনায় লেজ ছোটো ! দেহের রং বালি-ধূসর থেকে হলদেটে ধূসর। থাবা মলিন হলদেটে, তলাটা কালো বা ঝুল-পাঁশুটে। কান লালচে, কানের চূড়োয় ছোটো পেন্সিলের মতো কালো খাড়া চুল। যা দেখে মনে হয় 'সিয়াগোশ'-এর (ফেলিস ক্যারাকাল) সঙ্গে একটা সম্বন্ধের কথা। দেহের দুপাশের রঙ অনেক হাল্কা। সামনে ও পিছনের পায়ে কয়েকটা করে কালো টান।

বাসস্থান—উত্তর আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম এসিয়া, সেখান থেকে ভারত বাংলাদেশ, বর্মা, ইন্দোচীন এবং শ্রীলঙ্কা। বন্য বিড়ালদের মধ্যে খাটাশ সব-চেয়ে বেশি দৃষ্টিগোচর হয় হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত।

উত্তর ভারতে খাটাশ কিছুটা শুষ্ক খোলামেলা জমি, ঝোপ আগাছায় পূর্ণ জঙ্গল, নলখাগড়ায় ভরা নদী ও জলার পাড়। কাশ্মীরে শহরের আশেপাশে পাথরের খোঁদল এবং পুরনো পরিত্যক্ত অট্টালিকার ভিতরেও অনেকে বাস করে।

স্বভাব—দিনের বেলা দেখা গেলেও সকাল সন্ধ্যেতেই শিকারের খোঁজে বের হয়। চলাফেরায় মনে হয় যেন একটি ছোটো জাতের গুলবাঘ।

শিকার করে ছোটো ছোটো স্তন্যপায়ী জন্তু, পাখি এবং যখন গাঁয়ের ধারে আসে বা থাকে তখন গৃহপালিত হাঁস-মুরগী। এত দুর্জয় এদের সাহস যে গৃহস্বামীর উপস্থিতিতেও হাঁস-মুরগী ধরে নিয়ে চলে যায়।

খাটাশ নিজ শরীরের তুলনায় অসম্ভব ক্ষিপ্র ও শক্তিমান। সময়ে সময়ে বেশ বড়ো আকারের জীবকেও ঘায়েল করে ফেলে। উত্তর ভারতে ময়ূর, খরগোস ইত্যাদি এদের হাত থেকে নিস্তার পায় না। কুমায়ুনে প্রায়ই দেখা যায় এদের থাবায় শজারুর কাঁটা আটকে থাকতে। দেখেশুনে মনে হয়, ওদের মেরেছে না হয় মারতে চেষ্টা করেছে।

বছরে দু-বার সন্তান প্রসব করে ঃ এক, জানুয়ারি-এপ্রিল। দুই, আগস্ট বা নভেম্বরে। সাধারণতঃ 3টি, কখনও কখনও 5টি সন্তান প্রসব করে। জন্মাবার 11 থেকে 15 দিনের মধ্যে চোখ ফোটে। সময় বিশেষে গৃহপালিত বিড়ালের সঙ্গেও সহবাস করে সন্তান উৎপাদন করে। বাচ্চা খাটাশ সহজেই পোষ মানে এবং আদর পেলে সন্তুষ্টির ঘরর ঘরর শব্দও করে থাকে, যেমন আর সব বিড়ালে করে। খাটাশকে অর্থাৎ বন্য বিড়ালকে গৃহপালিত করার খবর পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব 2400 বছরে। কিন্তু মিশরে খ্রিস্টপূর্ব 1300 বছরই বোধহয় সঠিক। মিশরে বিড়ালের নামে একটি শহরই উৎসর্গীকৃত করা হয়, তার নাম 'বুবাস্টিস'। বিড়াল দেবী 'বাস্ট' পূজিত হতেন শিকার, প্রেম এবং সুখের জন্য। মধ্যযুগীয় ইউরোপে বিড়ালকে লোকে ভয় পেত এবং ঘৃণাও করত, কারণ তাদের সম্পর্ক ছিল শয়তান এবং ডাইনীদের সঙ্গে।



বাঘডাঁশ

দার্জিলিঙ গেলেই শহর থেকে বেশ দূরে বনে-বাদাড়ে ঘুরে পাখি দেখে বেড়াতাম। সেদিন সীমানাবস্তি পার হয়ে অনেক দূরে চলে গেছি। সঙ্গী আমার অল্পবয়সী কলেজে পড়া এক নেপালী ছেলে। সে আমার সঙ্গে ঘুরতে ভালোবাসতো। ফিরতে সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। দূরে উঁচুতে শহরের আলো দেখতে পাচ্ছি। অন্ধকারের মধ্যে চলতে হচ্ছে, মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালছি। একটা ছোটো পাহাড়ী নালা পার হবার সময় মনে হল আমাদের আগে একটা জন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে পার হচ্ছে। দুজনের হাতের টর্চ জ্বলে উঠে তার গায়ে পড়ল। জন্তুটা থমকে আমাদের দিকে ফিরে তাকাল, তারপরেই খুব দ্রুত লাফিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল।

এইটুকু সময়ের মধ্যে দেখলাম জন্তুটার বলিষ্ঠ দেহে সরু মুখ, মাথাটা লম্বাটে, বেঁটে কালো পা, ঘন কালো খাড়া ছোটো ঝুঁটি মাথা থেকে পিঠের মাঝখান দিয়ে লেজ পর্যন্ত নেমে গেছে। দেহের রঙ গাঢ় ধূসরাভ সাদার উপর পার্টাকিলের আভা তার উপর কালো ছোপ এবং ছোটো ও বড়ো কয়লার গুলের আকারে ছিট। সাদা গলায় কালো তিনটে মালা, মাঝেরটা চওড়া বেশি। লেজ মোটা থেকে সরু, তার উপর গোটা ছয়েক কালো চওড়া আঙটির মতো বেড়।

সঙ্গী সুব্বা তাদের ভাষায় বলে উঠল, 'নিট-বিড়াল'। জন্তুটা নকুল বংশের (ভিভেরিরিদি) এক প্রজাতি। নাম—বাঘডাঁশ, মাছ ভোঁদড় (ভিভেরা জিবেথা), ইং- লার্জ ইণ্ডিয়ান সিভেট। বাঘডাঁশের দেহ-মাথা 80 সেমি, লেজ 45 সেমি, ওজনে 7 থেকে 11 কেজি।

বাসস্থান—পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষত উত্তরবঙ্গ, নেপাল, সিকিম, ভুটান, আসাম, বাংলাদেশ থেকে বর্মা, দক্ষিণচীন, শ্যাম এবং মালয়েসিয়া।

খাদ্য—বাঘডাঁশ সারাদিন ঘুমিয়ে সন্ধ্যে হলেই শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গী ছাড়া একা একাই শিকার করে ছোটো ছোটো জন্তু ও পাখি। গৃহপালিত হাঁস-মুরগীর যম। প্রায় সব মাংসাশী প্রাণীর মতো যা মারতে পারে তাই খায়। সেই খাদ্য তালিকায় পড়ে সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া, মাছ, পাখির ডিম, এমনকি পোকামাকড়ও। এছাড়া ফলমূলও খেয়ে থাকে।

স্বভাব—সাধারণত গাছে চড়ে না কিন্তু প্রয়োজনে, বিশেষত কুকুর এদের দেখলেই তাড়া করে, তখন আত্মরক্ষার্থে গাছে চড়ে। এদের গায়ের গন্ধে কুকুররা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

প্রকৃতি বাঘডাঁশ ও অন্যান্য গন্ধগোকুল বা খট্টাসদের বড়ো জন্তুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে দাঁত ও নখর ছাড়াও এক অদ্ভুত প্রতিরক্ষার শক্তি দিয়েছে। পায়ুতে ফোঁড়ার মতো এক গ্রন্থি আছে। 6 সেমি × 4 সেমি মাপের সেই গ্রন্থি থেকে তীব্র দুর্গন্ধময় রস ক্ষরিত হয়। যখন বিপদ আসন্ন বুঝতে পারে, পালাবার আর কোনো উপায় নেই তখন এই পায়ুগ্রন্থি থেকে হলদে রঙের দুর্গন্ধ আচমকা আক্রমণকারী জন্তুর চোখে মুখে পিচকিরি দিয়ে ছিটিয়ে দেয়। আক্রমণকারী অকস্মাৎ এই অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়ে। চোখে দেখতে পায় না, বমনোদ্রেককারী দুর্গন্ধও সহ্য সীমার বাইরে চলে যায় তখন শত্রুর সেই হতভম্ব অবস্থায় এরা চম্পট মারে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই তীব্রগন্ধী রসের উপাদান অ্যামোনিয়া, জতু, স্নেহ এবং উদ্বায়ী তৈলের মিশ্রণ। পায়ুগ্রন্থির এই রস গন্ধদ্রব্য ও ওষুধ তৈরি করতে লাগে। তামাকে এই রস থেকে প্রস্তুত সুগন্ধি মেশানো হয়। ভারতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় কামোদ্দীপক ওষুধ তৈরির উপাদান হিসাবে। দক্ষিণ ভারতে মালাবারী ব্রাহ্মণদের দেখেছি খাঁটি এই জিনিস এক তোলা (১২ গ্রাম) কেনবার জন্য কি ব্যগ্রতা! ব্যবসায়ীরা এই সুযোগ গ্রহণ করে মাখন ও তেল

মিশিয়ে ভেজাল তৈরি করে খদ্দেরদের গছায়। অনেকে আবার এদের পুষে কাঠের হাতা দিয়ে পায়ুগ্রন্থিতে চাপ দিয়ে এই রস সংগ্রহ করে থাকে। আমেরিকা থেকে এদের গ্রন্থি থেকে উদ্ভূত বলে যে সুগন্ধি ভারতে আসে তা এদের গ্রন্থিরস থেকে তৈরি নয় তা তৈরি বীবরদের (বিভার) গ্রন্থি থেকে।

এদের ডাকও শোনা যায় না। পারিবারিক জীবনও আমাদের অজ্ঞাত। একা একা থাকে বলে এদের মিলনও ক্ষণস্থায়ী। এদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যা কিছু জানতে পারি তা এদের বন্দীদশা থেকেই।

প্রজননকাল মে-জুন মাস বলেই ধরা হয়। মাটির ভিতর গর্তে অথবা খুব ঘন গাছগাছড়ার মধ্যে সন্তান প্রসব করে 3-4টি, ক্বচিৎ একটি। বাঁচে 13 থেকে সাড়ে 15 বছর।

মালাবার ও ত্রিবাঙ্কুরে বাঘডাঁশের যে প্রজাতি (ভিভেরা মেগাসপিলা) তা আজ অবলুপ্তির পথে।



ভাম

হাজারিবাগ জেলার গিরিডিতে আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল মিস লাহিড়ী মাসিমার বাড়ি। তিনি ছিলেন রামতনু লাহিড়ীর মেয়ে। ছোট্ট বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। সামনেই বিশাল দুই ঝাঁকড়া মহুয়াগাছ। তাতে বাসা ছিল অনেকগুলি খানিকটা নেউল বা বেজির মতো দেখতে জন্তুর। অসম্ভব উপদ্রব করত। ঘরের চালে বা বাতায় তাদের আনাগোনা ছিল বেশ। সুবিধে পেলেই পালা মুরগী মারত। অসাবধানে রাখা টেবিলের উপর থেকে রাতের বেলায় গুড় জেলি জ্যাম চুরি করে খেতো। দিনের বেলায় দেখা প্রায়ই যেত না, গাছ থেকে তখন ক্বচিৎ নামত। একবার কদিনের এক শিশুকে বাইরের চাতালে তেল মাখিয়ে রোদে দেওয়া হয়েছিল। গাছ থেকে একটি নেমে সেই শিশুকে কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে যাবার সময় ধরা পড়ে। সেই শিশুটির তাই ডাকনাম হয়, 'ভামরি'। সেই শিশুটি বর্তমানে একজন নামকরা প্রসূতিবিদ্যা বিশারদ ও চিকিৎসক।

অল্প বয়সে উদ্ভট সব পশুপাখি পোষার সখ ছিল খুব। ওই মহুয়াগাছ থেকে অনেক কষ্টে একটি বাচ্চা সংগ্রহ করে পোষ মানালাম। নাম দিলাম ভামটি। নিশাচর বলে দিনের বেলা বেশিরভাগ সময় আমার বিছানার মাথার

কাছে রাখা একটি খালি কণ্ডেন্সড্ মিল্কের প্যাকিং বাক্সের মধ্যে পড়ে পড়ে ঘুমোত। সন্ধ্যের মুখেই সজাগ হয়ে আমার সঙ্গে নানারকম দুষ্টুমি করত, খেলত।

একদিন রাত্রে মার আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেল। দৌড়ে গেলাম মার ঘরে। পাশ দিয়ে ভামটি ছুটে পালাল। পরিস্থিতি হল, রাত দুপুরে ভামটি মার বুকের উপর বসে মার মুখের সামনে ফ্যাঁস ফ্যাঁস আওয়াজ করছিল। মা চমকে জেগে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছেন। অলক্ষুণে বলে মা ওকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। দেখলেই দূর দূর করতেন। মার অপছন্দটা সে বেশ বুঝত। ঘরে ফিরে ওর মাথায় চাঁটি মেরে বললাম, খবরদার আর ও ঘরে যাবি না। দিন পাঁচ-ছয় বেশ শান্ত ছিল। তারপর হঠাৎ মাঝরাতে ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। মা ফতোয়া দিলেন, হয় ও থাকবে না হয় তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন। সুতরাং তাকে মহুয়াগাছে তুলে দিতেই হল। মাঝে মাঝে রাত্রে আমার বিছানার কাছে আসত। ওর জন্যে খাবার রাখতে হতো। কিন্তু পরের বার ছুটিতে যখন আসি, তখন থেকে আর ভামটি আমার কাছে কোনোদিন আসে নি।

ভামটি ছিল মাংসাশী বর্গের অন্তর্গত গন্ধগোকুলা বংশের (ভিভেরিদি) এক প্রজাতি। নাম—ভাম বা সড়েল (পারাডোকসুরাস হারমাফ্রোডিটাস), ইং. পাম সিভেট, টডি ক্যাট।

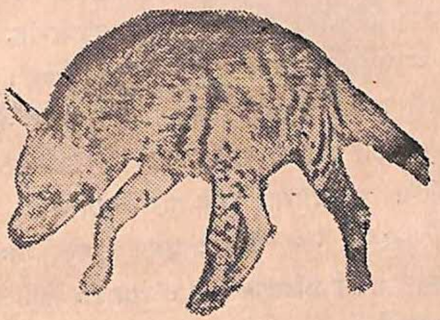
ভাম লম্বায় দেহ ও মাথা নিয়ে 60 সেমি, লেজও প্রায় অতবড়, ওজন 2·7 থেকে 4·5 কেজি। দেহের লোম বড়ো, খসখসে, কালো বা কালচে পাটকিলে। তলার লোম সাদাটে বা হলুদ। পিঠে লম্বা কালো টান এবং দেহের দুপাশে, ঘাড়ে ও উরুতে কালো ফুটকি। পা কালো বা গাঢ় পাটকিলে। চোখের নিচে সাদা ছোপ। এই ছোপ চোখের উপরদিকে কখনো সখন দেখা যায়। নাকের দুপাশেও সাদা ছোপ।

বাসস্থান—কাশ্মীর থেকে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে আসাম, দক্ষিণে উপদ্বীপাত্মক ভারতের সর্বত্র, কেবল সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতির মরুভূমি অঞ্চল ছাড়া। পূবে বর্মা, ইন্দোচীন ও মালয়েসিয়ায়।

স্বভাব—ভাম বা সড়েলকে যে কোনো গাছপালা সমৃদ্ধ অঞ্চলে দেখা যায়। গাছের উপরে দুই ডালের খাঁজে বা কাণ্ডের কোনো গর্তে দিনটা কাটায়। শহর বা গ্রামের আম বা তালগাছও তাদের প্রিয় বাসস্থল। তালের রস বা তাড়ির জন্যে বাঁধা কলসী থেকে রস চুরি করে খেতে খুবই পটু। আবার অনেককে দেখা

যায় বৃক্ষাবাস ছেড়ে মানুষের আবাসস্থলে ঘরের চালে বাতায় বা লোকজনপূর্ণ শহরের বাড়ির ছাদে কিংবা ড্রেনের মধ্যে বাসা বানাতে। রাতে খাদ্যান্বেষণে গাছে বা মাটিতে ঘুরে শিকার করে পাখি এবং ছোটোখাট স্তন্যপায়ীদের। ফল-পাকুড়ও খায়। মানুষজনের কাছাকাছি যারা থাকে তারা ইঁদুর শিকার করে খুব বেশি, হাঁস-মুরগীও মারে এবং আনারস ও কফির ক্ষেতে ঢুকে দৌরাত্মও কিছু কম করে না। পোষ মানে খুব সহজেই। পালকের খুব অনুগতও হয়।

প্রজননকালের কোনো স্থিরতা নেই। বছরের যে কোনো সময়েই বাচ্চা হতে দেখা যায়। প্রসব করে গাছের গায়ে কোনো গর্তে বা পাথরের তলায়। সাধারণত তিন থেকে চারটি বাচ্চা হতে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে উত্তর কানাড়ার পাহাড়ী অঞ্চলের জঙ্গলে আর-এক প্রজাতির সড়েলকে দেখা যায় তাদের বলা হয় 'পার্টকিলে ভাম' (পারাডোকসুরাস জার্ডনি), ইং. ব্রাউন পাম সিভেট। হিমালয় অঞ্চলের প্রজাতির নাম—পাহাড়ী ভাম (পাগুমা লারভাটা)।



হায়না

দুই পাড়ে দুই গ্রাম, গোলা আর চিতর। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে
ভেড়ানদী। ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে এই গোলা গ্রামে গিয়েছি।
জংলী গ্রাম। কয়েক মাইলের মধ্যে ভেড়া, দামোদর ও সুবর্ণরেখার সঙ্গমস্থলে
রাজারপ্পায় ছিন্নমস্তার মন্দির। গভীর জঙ্গলের মধ্যে তখন ছিল এই গ্রাম।

প্রথম দিনেই মাঝরাতে এক বিকট বীভৎস আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। সমস্ত
শরীর ঘেমে চুপচুপে। কণ্ঠা যেন কে চেপে ধরেছে। সমস্ত শরীরের লোম
খাড়া। আবার আওয়াজ শুনলাম। হাসি আর কাশির সংমিশ্রণে এক পৈশাচিক
রক্তহিম করা চিৎকার। মনে হল ঠিক জানলার পাশেই। ভয়ে বন্ধু আমায়
জড়িয়ে ধরেছে। সেও আমার মতো ঠকঠক করে কাঁপছে।

শিকারী আমি। ভয় পেলে চলবে কেন? সাহস সঞ্চয় করে কোনোরকমে
জানলার ধারে এলাম। বন্ধুও শক্ত করে আমায় ধরে এসেছে। চাঁদের আলোয়
দেখি, দশ বার হাত দূরে শালবনের ধারে কুকুরের মতো প্রায় দেখতে তবে বেশ
বড়ো চওড়া ভারীমাথা, সামনের দেহ পিছনের চেয়ে অনেক পুষ্ট। পিছনদিকটা
কেমন যেন ছোটো, হাঁটুভাঙা পায়ের উপর যেন খাড়া। মুখটা কেমন যেন

ভোঁতা, খাড়া কান, গা ছাই রঙের, ঘাড়ে ও পিঠে শুয়োর কুচির মতো কালো লোমের ঝুটি। গায়ে ডোরাকাটা কালো দাগ, ঝাঁকড়া লেজ।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। জন্তুটার ছবি আগে দেখেছি, চিড়িয়াখানাতেও দেখেছি। ডাক আগে শুনি নি। চাক্ষুষ পরিচয় এই প্রথম। জন্তুটা মাংসাশী বর্গের (কার্নিভোরা) ডোরাদার হায়না (হায়েনা হায়েনা), ইং· স্ট্রাইপড্ হায়েনা, হিন্দি লাকড়া বা হুঁড়ার। লেজ শুদ্ধ লম্বায় 150 সেমি, উচ্চতায় 90 সেমি ওজনে 38·5 কেজি। স্ত্রী-হায়নার ওজন প্রায় 34 কেজি।

বাসস্থান—পাকিস্তান, নিম্ন পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারত, আফগানিস্তান, ট্রান্স-ককেশিয়া, দক্ষিণ রুশীয় তুর্কিস্থান এবং এসিয়া মাইনর। মনে হয় আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রথম আসে।

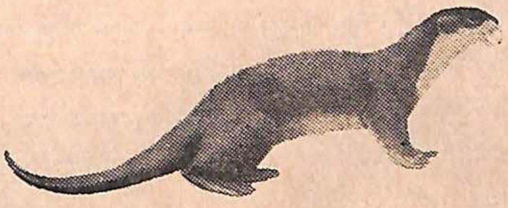
ভারতের বাইরে আরও কয়েক জাতের হায়না দেখা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার রোডেশিয়া ও মোজাম্বিকের উত্তরে 'পার্টিকলে হায়না' (হায়েনা ব্রুনিয়া), সাহারার দক্ষিণে আফ্রিকার প্রায় সর্বত্র 'চিতা হায়না' (ক্রকুটা ক্রকুটা) এবং দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার 'আর্ডউলফ' (প্রটেলস ক্রিস্টাটাস)।

স্বভাব—হায়নারা পছন্দ করে খোলামেলা খরাপ্রধান জায়গা, ঝোপ আগাছা-পূর্ণ পাহাড়ী এলাকার নালা খানাখন্দ আর যে জঙ্গলের তলায় আগাছা নেই। গভীর জঙ্গল এড়িয়েই চলে। দিনের বেলায় পাহাড়ের গুহা বা কন্দরে, কোনো বড়ো পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে গর্ত সেখানে বাস করে। অনেকসময় দেখা যায় শজারুর গর্তকে বেছে নিতে। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা শীতে এদের গায়ের লোম বড়ো হয়।

পূর্ণমাত্রায় নিশাচর বলে এদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। প্রাণি-রাজ্যে এরা মুর্দাফরাশ অর্থাৎ পচাগলা মৃতমাংসভোজী। চোয়াল ও দাঁতের জোর অসম্ভব। যে কোন মোটা হাড় অবলীলাক্রমে ভেঙে ফেলে। খাদ্য নিয়ে কোনো শক্তিশালী বড়ো জন্তুর সঙ্গে ঝগড়া করে না। সব সময় দূরত্ব বজায় রাখে। তাদের খাওয়া শেষ বা পরিত্যক্ত হলে তখনই এরা এগিয়ে আসে।

প্রজনন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে গ্রীষ্মে 3-4টি বাচ্চা প্রসব করে। খুব সহজে পোষ মানে। বন্দীদশায় 12 থেকে 14 বছর বাঁচতে দেখা গেছে।

ভারতের অনেক স্থানে হায়নার জিভ ফোঁড়া ও টিউমারের এবং চর্বি বাতের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।



ভোঁদড়

ছেলেবেলায় আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আমায় সবচেয়ে আকর্ষণ করত সরীসৃপ ভবনের পাশে সিমেন্ট বাঁধানো এক বড়ো চৌবাচ্চার ভিতরে গোটা তিন-চার অদ্ভুত চেহারার পশু। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুসী'তে এদের ছবি ও ছড়া ছিল। তাই চিনতাম। খোকার নাচনের চেয়ে ওদের নাচন-কোঁদনই আমায় আকৃষ্ট করত বেশি।

এরা হচ্ছে সেই 'ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা'। ভোঁদড়, উদ্, উদ্বিড়াল (লুটা পেরস্পিসিলনাটা), ইং. স্মুদ্ ইণ্ডিয়ান অটার, হিন্দি পানি কুত্তা। উদ্‌বংশীয় (মুস্টেলিডি) শক্তসমর্থ চেহারার ভোঁদড়ের মাথা দেহ 65-75 সেমি, লেজ 40-44 সেমি, ওজন 7-11 কেজি।

বাসস্থান—সমগ্র ভারতে, হিমালয়ের তরাই অঞ্চল ও পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ থেকে দক্ষিণে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এবং বাংলাদেশ। ভারতের বাইরে বর্মা, ইন্দোচীন এবং মালয়। দেখা যায় হ্রদ, নদী, বড়ো পুষ্করিণী, খাড়ির মুখ ও খালের ধারে।

খাদ্য—মাছই প্রধান। মাছের অভাব ঘটলে যা শিকার করতে পারে তাই খায়। জলজ জীবন হলেও, ডাঙাতেও কোনো অসুবিধে ভোগ করে না। জল ও খাদ্যের খোঁজে বহুদূর পর্যন্ত চলে যায়। গর্তে বা পাথরের খোঁদলে তখন থাকে এবং অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীদের মতো শিকার করে।

লম্বাটে গোলাকার দেহে নরম মসৃণ ও তেল চকচকে ছোটো চুলে ভরা চামড়া। কালচে ও লালচে চকোলেট-পাটকিলে গায়ের রঙ। তেল চকচকে গা বলে

গা জলে ভেজে না, ওয়াটারপ্রুফের কাজ করে। প্রলম্বিত চোয়ালে নাকের ডগায় লোম নেই, আছে খাড়া খাড়া শক্ত চুল, যা কখনও জলে ভিজে ঝুলে পড়ে না, সবসময়েই খাড়া থাকে। মোটা মাংসল চ্যাপ্টা লেজ মোটা থেকে সরু। পায়ের পাতা ঝিল্লী দিয়ে জোড়া, তারমধ্যে পাঁচটি করে নখরসহ আঙুল। পিছনের পা ও পায়ের পাতা সামনের চেয়ে বড়ো। কান ছোটো। জলে বিচরণ করার সময় নাকের গর্ত এক পাতলা চামড়ার আবরণে ঢেকে যায়।

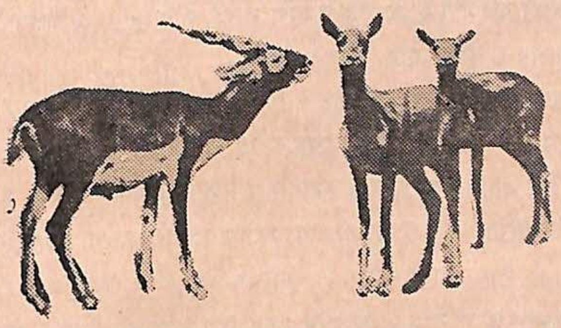
স্বভাব—জলের ভিতর এদের সাবলীল গতি ও ছন্দের সাঁতার চিড়িয়াখানার চৌবাচ্চার ধারে দাঁড়িয়ে দেখেছি ঘণ্টার পর ঘন্টা। যখন আস্তে সাঁতার দেয় তখন সামনের পা দিয়ে জল কাটে। জোরে সাঁতার কাটার সময় পিছনের বড়ো পা, সারা দেহ ও লেজ একযোগে কাজ করে। পিছনের পায়ে জলের ভিতর সজোরে ধাক্কা মেরে, সর্পিল চলনে লেজ দিয়ে দিকনির্ণয় করে ভোঁদড় দ্রুত চলে। মাছ ছুঁড়ে ফেললেই মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে মাছের পিছনে তাড়া করে কখনও সোজা, কখনও উল্টে, কখনওবা এঁকেবেঁকে সর্পিল গতিতে এবং মাছ তার হাত এড়াতে যতই চেষ্টা করুক সে ধরে ঠিকই।

ভোঁদড় তার খোঁচা খোঁচা সবসময় খাড়া গোঁফ দিয়ে জলের ভিতর ঝাপ্সা চোখের অসুবিধে দূর করে, কারণ ওই গোঁফগুলো ভীষণ সংবেদনশীল। আর সংবেদনশীল পায়ের থাবা। মাছ, যদি পাথরের আড়ালে বা কাদার মধ্যে লুকোয় গোঁফ ও থাবা দিয়ে তার সঠিক অস্তিত্ব জেনে নিয়ে সে তাকে ঠিক ধরবেই। মুক্তি নেই। দাঁতও পিচ্ছিল মাছকে ধরার খুবই উপযুক্ত। বিশেষত চোয়ালের প্রতিটি দাঁত খোঁদল করা এবং তার ধারে ছোটো ছোটো তীক্ষ্ম খোঁচগুলি রয়েছে পিচ্ছিল শিকারকে ধরে রেখে দু-টুকরো ও মচ্‌মচ্‌ করে চিবিয়ে খাবার জন্যে।

একবার ওড়িশার চিল্কা হ্রদে ওদের পারিবারিক শিকার করার দৃশ্য দেখে-ছিলাম। অর্ধবৃত্তাকারে প্রত্যেকে 45 থেকে 50 মিটার ফাঁক হয়ে তাদের সামনে আসা মাছের জন্য ডুব দিয়ে একটা করে মাছ মুখে চেপে ধরে তুলে আনছিল। ওদের মাছ ধরার পন্থা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

উত্তেজিত হলে জোরে তীক্ষ্মকণ্ঠে একটা চিৎকার করে, আর ছোট্ট শিসের মতো আওয়াজে পরস্পরকে সতর্ক করে থাকে।

শুনেছি কোথাও কোথাও ভোঁদড়কে পোষ মানিয়ে তাদের দিয়ে মাছ ধরানো হয়।



কৃষ্ণসার

মুঘল কাংড়া রাজপুত ইত্যাদি চিত্র বা অনুচিত্র ছেলেবেলায় যখন প্রথম দেখি তখন একটি পিঠ কালো, পেট সাদা, স্ক্রুর মতো পেঁচানো ঢেউ খেলানো শিংওয়ালা হরিণ আমায় খুব আকৃষ্ট করে। ছবিতে দেখতাম কখনও সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কখনও সামনের পা মুড়ে পিছনের পা ছড়িয়ে শূন্যে লাফিয়ে ছুটছে আর পিছনে অশ্বারোহী শিকারী ধনুক থেকে তীর ছুঁড়ছে। হরিণটির নাম আমি জানতাম না। পরে জেনেছিলাম ওটি খাঁটি হরিণ নয়, ওর নাম—কৃষ্ণসার, কালসার (অ্যাণ্টিলোপ সেরভিকাপরা), ইং. ব্ল্যাক বাক। সংস্কৃতে একে মৃগ বা এণ বলে। প্রকৃতির কোলে মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় দেখতে রাজপুতানা ও পাঞ্জাবে, অবশ্য পাকিস্তান হবার আগে ঘুরেছি। পায়ের ছাপ নজরে পড়লেও সর্বদাই দর্শনের সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত হয়েছি। আমি না দেখলেও বহু লোকে কিন্তু দেখেছেন।

মৃগ অ্যাণ্টিলোপ ও কুরঙ্গ (গ্যাজেল) গবাদি বংশের (বভিদ) একটি উপবিভাগের মধ্যে পড়ে। গরু মহিষ ছাগল ভেড়ার কোনো একটি জাতের মধ্যে ফেলা না গেলেও, দুজাতেরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এই মৃগের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। বিবর্তনের গোড়ার দিকে গঠনবৈচিত্র্যে এরা ছিল আদিম রোমন্থক জীব। বিশ্বাস করা হয়, সেই প্রাচীন মৃগগোষ্ঠীর একটি শাখা থেকে গরু

মহিষ অপরটি থেকে ভেড়া উদ্ভূত হয়েছে। কারণ গরু বা ভেড়া এই দুইয়ের গঠনের মধ্যে বর্তমান মৃগগোষ্ঠীর ছাপ খুবই পরিস্ফুট। মৃগগোষ্ঠীর প্রাণীরা নানা আকার ও ছাঁচের হয়ে থাকে।

মৃগদের গঠনের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটা সুন্দর স্বাভাবিক সৌষ্ঠবের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো কোনো স্ত্রী-জাতির শিং একদম নেই, কারও বা আছে। শিং সাধারণত লম্বাটে, কমবেশি গোলাকার, গোল গোল আঙটির মতো পরপর সাজানো। গরু ভেড়া ছাগলের মতো শিং ফাঁপা বা মৌমাছির চাকের মতন নয়। প্রায় সবটাই কঠিন। চোখের নিচে ও খুরের ভিতর গ্রন্থি থাকে যা গরু ছাগলের থাকে না। এই গ্রন্থি পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের একটি উপাদান। মৃগগোষ্ঠীর মধ্যে কুরঙ্গরা সৌষ্ঠবপূর্ণতায় শ্রেষ্ঠ। কুরঙ্গরা মৃগদের থেকে একটু তফাতের কারণ এদের পায়ে হাঁটুর কাছ থেকে লোম গজায়। ভারতে বা তার সীমানায় যেসব মৃগ দেখা যায় তারা হল, চিরু (টিবেটান অ্যাণ্টিলোপ), কুরঙ্গ বা চিঙ্কারা (ইণ্ডিয়ান গ্যাজেল), কৃষ্ণসার, চৌশিঙ্গা (ফোরহর্নড অ্যাণ্টিলোপ) এবং নীলগাই (ব্লু বুল)। কৃষ্ণসার কিছু ঝোপঝাড় ও শস্যখেত সহ উন্মুক্ত সমতলের বাসিন্দা।

পূর্ণবয়স্ক কৃষ্ণসার বা কালসার ঘাড় পর্যন্ত উচ্চতায় প্রায় 80 সেমি। গড় ওজন 40 কেজি। শিং লম্বায় 50 সেমি, কিন্তু দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে কখনও কখনও লম্বায় আরও বড়ো দেখা যায়। ভারতে মৃগ গণে একমাত্র কৃষ্ণসারেরই এমন উজ্জ্বল রঙ ও পেঁচানো শিং। এই শিং খাড়া করে দাঁড় করালে উচ্চতায় প্রায় মাটি থেকে ঘাড় পর্যন্ত পেঁছায়।

শৈশবে গায়ের রং স্ত্রী-জাতির মতো হালকা হলদেটে বাদামী। তিন বছরে পড়লে কালো হতে শুরু করে। দক্ষিণ ভারতে পূর্ণবয়স্কদের কদাচিৎ কালো দেখা যায়, সাধারণত গাঢ় পাটকিলেই হয়। বর্ষার পরে গায়ের রঙে মখমলের ঔজ্জ্বল্য বাড়তে থাকে। দু'বছর বয়েস হলে একটি বড়ো প্যাঁচ দেখা যায়। তার আগে শিং সোজাই থাকে। তিন বছরের শেষে পূর্ণ হয় সবগুলি প্যাঁচ। শিংওয়ালা স্ত্রী দেখা যায় ক্বচিৎ। 19 থেকে 23 মাসের মধ্যে স্ত্রী-জাতি যৌন-ক্ষমতা লাভ করে

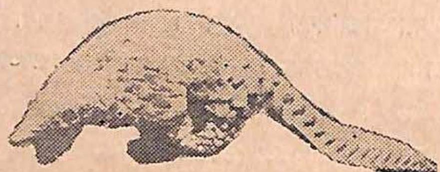
স্বভাব—ঘাস এবং নানা জাতীয় খাদ্যশস্য। সাধারণত দুপুর পর্যন্ত চরে; তারপর শুয়ে বসে বিশ্রাম নেয়। পড়ন্ত বিকেলে আবার চরতে শুরু করে।

কালসারের সৌন্দর্যের কাছে পৃথিবীর সব মৃগই হার মানে। শ্রবণশক্তি মাঝামাঝি, ঘ্রাণশক্তি মোটামুটি। দৃষ্টিশক্তি প্রখর ও গতি অতি দ্রুত এবং এই দুই ক্ষমতা এদের আত্মরক্ষার অবলম্বন। একমাত্র শিকারী চিতাই দৌড়ে কাবু করতে পারতো। বিপদাশঙ্কা বুঝলেই সাধারণত 20-30 এর দলটা জোর কদমে ছুটতে থাকে। দলের নেতৃত্ব থাকে সতর্ক প্রহরারতা বৃদ্ধার উপর।

প্রজননকাল সারা বছরই তবে ফেব্রুয়ারি-মার্চেই বেশি, কারণ এইসময় স্ত্রীর অধিকার লাভের জন্য দুই পুরুষকে প্রায়ই লড়াই করতে দেখা যায়। পুরুষের চালচলনে আত্মগরিমা ফুটে ওঠে, শূন্যে মুখ তুলে পিঠের উপর শিং ঠেকিয়ে, চোখের দুপাশের গ্রন্থি উন্মুক্ত করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করতে থাকে।

অনেকসময় দেখা যায় পুরুষকে তার প্রিয় সঙ্গিনী নিয়ে হারেম ছেড়ে চলে যেতে। যারা হারেম ছাড়ে না তারা অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ এমনকি মানুষের সঙ্গেও লড়াই চালাতে চায়। 180 দিন গর্ভধারণ করার পর একটি বা দুটি সন্তান প্রসব করে। প্রসবের পর ছানাদের মা বড়ো ঘাসের মধ্যে তাদের লুকিয়ে রাখে। একটু বড়ো হলে তাদের নিয়ে এসে দলে যোগদান করে।

বর্তমানে এদের সংখ্যা কমে আসছে। পশ্চিমবঙ্গে সব মৃগদাবে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে, মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় নয়।



বনরুই

ছেলেবেলায় প্রথম ছবি দেখি ও পড়ি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'পশু-পক্ষী' বইয়ে। তার দু-এক বছর বাদে চাক্ষুষ দেখলাম গিরিডিতে। ছালায় ভরে এনেছিল দেহাত থেকে দেহাতী লোক। ঝোলা থেকে মাটিতে ঢালার পর দেখেছিলাম, সারা শরীরটা রুইমাছের চেয়ে বড়ো বড়ো আঁশ দিয়ে ঢাকা। মুখ ও লেজ কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা গোল বল হয়ে আছে। লোকটি অনেক টানাটানি করেও জন্তুটাকে সোজা করতে পারল না। আঁশের রঙ মেটে হলদেটে। স্থানীয় এক কবিরাজের জন্যে এনেছে, তিনি অর্ডার দিয়েছেন, কিনবেন। লোকটির কাছে জেনেছিলাম এই আঁশ দিয়ে বাত ও অর্শের আঙটি হয়। মাংসও কাজে লাগে।

বহু বছর পরে মহীশূরের জঙ্গলে জন্তুজানোয়ারের জল খাবার জায়গায় চন্দ্র-ভেলু বলে এক ফরেস্ট রেঞ্জার আমায় দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বড়ো জন্তু তো সব দেখেছেন কিন্তু একটা ছোটো জন্তু দেখাব যা কখনও দেখেন নি। দু'রাত্রি ধৈর্য ধরে মশার কামড় খেয়ে বসে থাকার পুরস্কার পেলাম তৃতীয় দিনে শুক্লপক্ষের চতুর্দশীর দিন রাত একটায়। একটা জন্তু দেহ-মাথা নিয়ে 60-75 সেমি হবে, লেজটা 45 সেমির মতো বড়ো বড়ো আঁশের বর্মে ঢাকা, আঁশহীন লম্বাটে ছুঁচলো মুখ নিয়ে জংলা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে ক্রমে কাদার উপর দিয়ে জলের ধারে যাচ্ছে অতি ধীরগতিতে হেলতে দুলতে। সামনের পায়ের চেয়ে পিছনের পা বড়ো। দেহের ভারসাম্য রাখছে লেজটাকে মাটি থেকে অল্প তুলে। সামনের পায়ের নখর বেশ বড়ো, সেটা দুমড়ে ভিতরে রেখেছে। পিছনের পায়ের

নখরগুলোকে রেখেছে মাটি থেকে শূন্যে, প্রায় গোড়ালির উপর ভর করে চলেছে। হঠাৎ পিছনের দুই পা ও লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল ক্যাঙ্গারুর মতো। তলায় খোঁচা খোঁচা লোম, আঁশ নেই। এদিকওদিক মুখ ঘোরাল। চন্দ্রভেলু কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, 'আলাঙ্গু'। আমি তাঁর কানে ইংরেজি নামটা বললাম। তিনি দুদিকে মাথা নেড়ে হাঁ জানালেন।

আলাঙ্গু যখন বুঝল ধারে কাছে ওর কোনো শত্রু নেই, তখন জলের কিনারায় এসে তুণ্ড আকারের ছুঁচলো গোল মুখ থেকে সরু দড়ির মতন লম্বা জিভ বের করে এত তাড়াতাড়ি জলের মধ্যে ডোবাল আর মুখের মধ্যে ভরতে থাকল যে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত যে এত দ্রুত ঢোকানো আর বের করা সম্ভব।

জন্তুটি আঁইশী বা শল্ক বর্গের একটি মাত্র বংশের (মানিদ) এক প্রজাতি। নাম—বনরুই, বজ্রকীট (মানিস ক্রাসসিকওডাটা), ইং· ইণ্ডিয়ান প্যাঙ্গোলিন। রংপুর জেলায় বলে 'কেওট মাছ'। দেহে 11 থেকে 13টি আঁশের সারি।

বাসস্থান—হিমালয়ের পাদদেশ ধরে ভারতের সর্বত্র, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। অপর প্রজাতি আকারে একটু ছোটো, 'চীনে বনরুই' (মানিস পেনটাডাকটাইলা)। তাকে দেখা যায় আসাম, পূর্ব হিমালয়ের নেপাল থেকে বর্মা ও দক্ষিণ চীনে। তাদের দেহ-মাথা 48-58 সেমি, লেজ 33-38 সেমি। দেহে 15 থেকে 18টি আঁশের সারি।

খাদ্য—উই, পিঁপড়ে ও তাদের ডিম। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, খাদ্য সংগ্রহ করে গন্ধের সাহায্যে। বন্দীদশায় বাজার থেকে পিঁপড়ের ডিম কিনে কাঁচা ডিম, মাংসের কিমা, দুধ ও মাটি মিশিয়ে খাওয়ালে বছর দুই বেশ বাঁচে। উত্তেজিত হলে মুখ দিয়ে হিস্ হিস্ এক শব্দ করে।

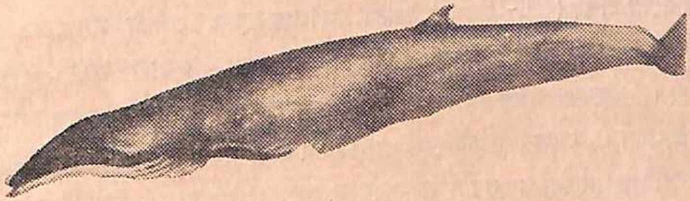
স্বভাব—বনরুই পূর্ণমাত্রায় নিশাচর বলে প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখা খুবই কঠিন। সামনের বড়ো বড়ো নখর দিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে থাকে। সেই সুড়ঙ্গ জায়গা বিশেষে 3·5 মিটার পর্যন্ত লম্বা, 20 সেমি চওড়া এবং সুড়ঙ্গের শেষে 2 মিটার ব্যাসের আবাস-ঘর।

সামনের নখর দিয়ে পিঁপড়ে ও উইঢিবি ফালা ফালা করে ছুঁচলো মুখ গর্তের ভিতর ঢুকিয়ে সরু লম্বা আঠালো জিভ দিয়ে উই বা পিঁপড়েদের নিমেষের মধ্যে মুখগহ্বরে প্রবেশ করায়। পিঁপড়েরা কিছুই করতে পারে

না, কারণ নাকের গর্ত চামড়ার পর্দা ও চোখ উপরকার মোটা পাতায় ঢেকে যায়। আঁশের ফাঁকে পিঁপড়ে ঢুকলে গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেয়। গাছে চড়ে পিঁপড়ের বাসা ভেঙে ডিম খেতেও খুব পটু।

নিশাচর বলে প্রজননকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যেই সন্তান প্রসব করতে দেখা গেছে। দক্ষিণ ভারতে জুলাইতেও সন্তান প্রসব করতে দেখা গেছে। সন্তানদের পিঠে অথবা লেজের উপরে রেখে মা-বনরুই প্রথম অবস্থায় চলাফেরা করে।

অদ্ভুত জিভ পরীক্ষা করার জন্যে সংগ্রহ করে শব ব্যবচ্ছেদে দেখি জিভটা লম্বায় 25 সেমি, মোটা প্রায় 5 মিমি। বুকের ভিতর দিয়ে শ্রোণীদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। পাকস্থলীর দেওয়াল মাংসপেশী সমৃদ্ধ এবং তার ভিতর কয়েকটা পাথরকুচি দেখেছিলাম খাদ্য চূর্ণ করার জন্য।



নীল তিমি

এই অদ্ভুত বিশাল স্তন্যপায়ী জীবটিকে তার নিজস্ব পরিবেশে বা জীবন্ত কোনো অবস্থাতেই দেখার সৌভাগ্য হয় নি। শুধু দেখেছি তার কংকাল, কিছু ফটো আর দু'একটা চলচ্চিত্রে। যাঁরা জাহাজে 'কাজ করেন বা জাহাজে করে এদিকওদিক ঘোরাফেরা করেন তাঁদের মধ্যেও খুব কম লোকের, আঙুলে গোনা যায় এমন, এই সৌভাগ্যলাভ হয়েছে। আমার এক বন্ধু হেমন্ত মিত্র ছিল এক মালবাহী জাহাজের রেডিও অফিসার। সেই আমার জানা একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী।

পশ্চিমকাশ তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। পূবে দূরপ্রাচ্যের আকাশে কালো মেঘ। তোড়জোড় চলছে। সেইসময় হেমন্তর জাহাজ শ্রীলংকার ত্রিনকোমালি থেকে সিংগাপুরের দিকে পাড়ি দিল। দ্বিতীয় দিনে রেডিওতে সংবাদ এল ভারত মহাসাগরের বুকে জাপানি ডুবোজাহাজ দেখা গেছে। গন্তব্য-পথ ছেড়ে জাহাজের মুখ ঘুরে দক্ষিণে সোজা কুমেরুর দিকে চলল। তিনদিনের দিন সকালে হেমন্ত তার রেডিও ঘরে বসে আছে হঠাৎ দেখতে পেল দূরে একটা কালো বড়ো বস্তু সমুদ্রের বুকে ভেসে উঠেছে। ভয়ে তার হাতপা ঠাণ্ডা। দেখল আস্তে আস্তে পেরিস্কোপ তুলছে। সে আর কোনো দিকে না তাকিয়ে 'সাবমেরিন সাবমেরিন' বলে চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল ক্যাপ্টেনের ঘরে। ক্যাপ্টেন প্রথমেই তাকে বকুনি দিলেন আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার জন্যে। এই আতঙ্ক জাহাজের সকল কর্মীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে মহা বিপদের সৃষ্টি হবে। তারপর তিনি চটপট বাইরে এসে দূরবীন দিয়ে দেখে বললেন, সাবমেরিন নয়, তিমি, একটা নীল তিমি।

তিমিটা জাহাজের খুব কাছে এসে ঘুরপাক খেয়ে ডুবল। আন্দাজ 60 ফুটের মতো লম্বা (18-19 মি), পিঠটা নীলচে-ধূসর, তলাটা সাদা, তলার ঠোঁট থেকে বুক পর্যন্ত চষাখেতের মতো লম্বা টানা খাঁজকাটা লাইন নেমে এসেছে। বুকের পাশে পাখনা দুটো সমান্তরালে, লেজের জোড়া-পাখনার তলাও সাদা। জলের ভিতর বেশ খানিকক্ষণ ডুবে থেকে আবার ভেসে উঠে মাথার উপর বসানো নাকের ছাঁদা দিয়ে সোজা ফোয়ারার মতো জল তুলে ছাড়ছে। ফার্স্ট মেট্, চীফ ইনজিনিয়ার থেকে প্রায় সব কর্মীই বলল, খুব শুভ লক্ষণ। কোনো বিপদই ঘটবে না। এমনি তাদের অন্ধবিশ্বাস। ক্যাপ্তেন বার দুই দেখেছেন, আর কেউ কখনও দেখে নি।

নীল তিমিটা তিনদিন জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে ছিল, তারপর দিগন্তে মিলিয়ে গেল। জাহাজ মুখ ঘুরিয়ে ক্রিষ্টমাস দ্বীপের পাশ দিয়ে সালাট সুন্দার ভিতর দিয়ে এক সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুর বন্দরে পৌঁছল। বন্দরের সবাই অবাক কি করে জলের মধ্যে পোতা জাপানি মাইনের ভিতর দিয়ে আসা গেল। অসম্ভব ব্যাপার। নাবিকরা সবাই ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানাবার সঙ্গে তিমিকে ধন্যবাদ জানাল। কিন্তু পরদিন সকালেই সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে।

হেমন্ত তিমি বর্গে (কেটাসিয়া) দন্তহীন গোষ্ঠীর (মিষ্টিকেটে) অন্তর্গত চিরুনীদাঁত বংশের (বালিনোপটেরিদি) এক প্রজাতি—নাম নীল তিমি বা ররকোয়াল (বালিনোপটেরা ফিজালাস), ইং. ফিনব্যাক হোয়েল, কমন ররকোয়াল দেখেছিল। তুণ্ড থেকে লেজ পর্যন্ত লম্বায় 20 মি, ওজনে 50 টন। বুকের দুপাশের পাখনা মাছের মতো নয়। উপর থেকে চামড়া ও মাংস তুলে নিলে সামনের পা-ই যে পাখনার আকার ধারণ করেছে তা বেশ বোঝা যায়। এই পাখনার দৈর্ঘ্য দেহের এক নবমাংশ। পিঠে একটি বাঁকা পাখনা লেজের দিক ঘেঁষে, উচ্চতা 0·5 থেকে 1 মি। লম্বায় 26 মি পর্যন্ত হতে দেখা যায়। ঝালরের মতো চিরুণী দাঁত (**Balaen**) তুণ্ডের একটু পিছনে মুখের ভিতর উপরপাটি থেকে নেমেছে এক তৃতীয়াংশ সাদা বাকি অংশ নীলচে-ধূসরের সঙ্গে ফিকে ছাই-ধূসর এবং হলদে-ধূসরের ছিট। উপরের চামড়ার নিচে থাকে চর্বির স্তর তাকে 'ব্লাবার' বলে। স্তর প্রায় 10-12 সেমি হয়। উপরনিচ করে লেজ ঝাপটিয়ে লেজের পাখনা এমনভাবে বাঁকায় যেন জাহাজের জলকাটা চাকা ঘুরছে। তাড়া খেলে ঘণ্টায় 48 কিমি গতিবেগ তোলে।

খাদ্য—সমুদ্রের বাগদা চিংড়ি (ইউফাসিয়া সুপারবা) কুমেরু অঞ্চলে, ওই জাতীয় কবচী (মেগানাইকটিফানেস নরভেজিকা) সুমেরু অঞ্চলে, এরা সমুদ্রের উপরিভাগে বা অল্প নিচে কয়েক বর্গ কিমি ধরে বাস করে, যেখানে জলের উত্তাপ দু'ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের নিচে। এই চিংড়ি বা কবচীদের বলা হয় 'ক্রিল'। খায় তলার ঠোঁট ফাঁক করে ব্যাগের মতো ঝুলিয়ে দিয়ে কবচীর ঝাঁক মুখের মধ্যে পুরে বন্ধ করে তারপর জিভ দিয়ে চাপ দেয়। চিরুণী দাঁতের ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে গেলে জলের মধ্যে ডুব দিয়ে গিলে ফেলে। এছাড়া প্ল্যাংকটন, ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীব, ছোটো মাছও খেয়ে থাকে যখন সুমেরু কুমেরু অঞ্চল ছেড়ে পরিযান করে উষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ সাগরের জলে। তাই ভারত মহাসাগরের বুকে এদের এবং অন্যান্য জাতভাইদের দেখা যায়।

প্রজননকাল প্রধানত শীতকাল। এক বছর অন্তর একটি করে সন্তান 10-12 মাস গর্ভধারণ করে প্রসব করে। যমজ সন্তান শতকরা একটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়। জন্মকালীন দৈর্ঘ্য 6-6·5 মি। ছমাস বুকের দুধ খায়, 12 মি লম্বায় বাড়ে। প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে 3·5-4 বছরে।

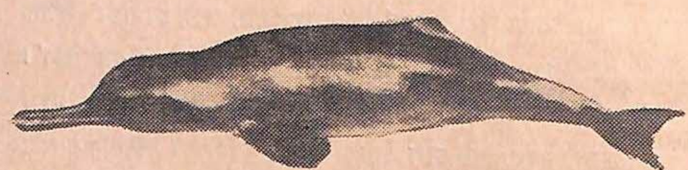
বড়ো নীল তিমি (বা· মুস্‌কুলাস), ইং· ব্লু হোয়েল, হিন্দি মগর মাছ, রাঘোয়া, লম্বায় গড়ে পুরুষ 22·5, স্ত্রী 23·5 মি, ওজনে 80 এবং 85 টন। সবচেয়ে যা পাওয়া গেছে তা 34 মি ওজনে 150 টন।

আনুমানিক 15 থেকে 12 কোটি বছর আগে মহাসরট যুগে (জুরাসিক) যে দুই বৃহদাকার ডাইনোসর ডিপ্লোডোকাস ও ব্রণ্টোসরাস ছিল, তাদের চেয়েও এরা লম্বায় বড়ো।

আরও দুটি নীল তিমি ভারত মহাসাগরে দেখা যায়। এক, 'সেই তিমি' (বা· বোরিয়ালিস) আকারে ছোটো, লম্বায় পুরুষ 13·5, স্ত্রী 14·5 মি, সর্বোচ্চ 18 মি। দুই, ছোটো ররকোয়াল (বা· আকুটোরোস্ট্র্যাটা), ইং· পাইকড্‌ বা লেসার ররকোয়াল, আকারে সবচেয়ে ছোটো, 11·5 মি।

তিমির চর্বি থেকে মাংস, অস্থি, চামড়া সবেরই মূল্য থাকার জন্যে একসময় প্রতি বছর বহু মারা পড়ত। বর্তমানে আইন করে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

পুরাকালে কিছু স্তন্যপায়ী জন্তু জলে ফিরে গিয়ে জলজীবনে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। তবুও জলের ভিতর বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে জলের উপরে আসতেই হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের গর্ত তাই মাথার উপরে। 1500 মি পর্যন্ত জলের তলায় যেতে পারে।



শুশুক

গত 11 অক্টোবর 1982 সুন্দরবনে বাগনা ফরেস্ট অফিসে যাবার পথে ঝিলা নদীর বুকে দুটি জীবকে দেখলাম মাঝে মাঝে ভুস করে জলের উপর উঠে ডিগবাজি খেয়ে জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। আবার ভেসে উঠছে দু-তিন মিনিট বাদে। গত 14 সেপ্টেম্বর 83তেও এদের দেখেছিলাম ক্যানিং থেকে গোসাবা যাবার পথে মাতলার উপর। এককালে কলকাতার হুগলি নদীতেও দেখা যেত, এখন আর চোখে পড়ে না গঙ্গার জল অতিরিক্ত মাত্রায় দূষিত হবার ফলে। বহুদিন আগে শিলং যাবার পথে আমিন গাঁওয়ে ব্রহ্মপুত্র পার হবার সময় স্টিমার থেকে ব্রহ্মপুত্রের উপর প্রচুর দেখতাম। মাতলার উপর দেখে সেকথা মনে পড়ে গেল।

বর্তমানে ফারাক্কায় 'ফিডার ক্যানাল'-এর পরিষ্কার জলে দেখা যায়। কিন্তু গঙ্গাতে একটারও দেখা মেলে না। এই নিয়ে কথা হচ্ছিল ফারাক্কার এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। ওখানে টারবাইন জেনারেটর চালু হবে শিগগিরই। জেনারেটরের কনডেনসারের জন্য ফিডার খাল থেকে পাম্প করে জল নিয়ে কনডেনসারের কাজ সেরে সেই গরম জল যা 34-35 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপাঙ্কের তা এসে পড়বে পুকুররূপ এক চৌবাচ্চায়, তারপর সেই জল ছেড়ে দেবে খালে তখন তার তাপাঙ্ক হবে 27-28 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই চলবে অহরহ। আমি সেই ইঞ্জিনিয়ারকে বলেছি, ফিডার খালে তোমাদের ঐ গরম জলে এখন শীত-কালে মনে হয় না এই জীবদের অসুবিধে হবে কিন্তু গ্রীষ্মে এরা কতটা গরম

সহ্য করতে পারবে তা বলতে পারছি না। ওরা তখন চলে যায়, না থাকে তা দেখতে বলেছি। গঙ্গায় তখন দেখা যায় কিনা তাও দেখা দরকার।

জীবগুলি স্তন্যপায়ী তিমি বর্গের (কেটাসিয়া) অন্তর্গত প্লাটানিসটিদি বংশের এক প্রজাতি। নাম—শুশুক, শিশুক (প্লাটানিসটা গ্যানজেটিকা), ইং. গ্যানজেটিক ডলফিন। ডলফিন বা সমুদ্র শুশুকের জাতভাই। তারা থাকে সমুদ্রে, এরা নদীতে। লম্বায় 2·3 থেকে 2·6 মিটার। স্ত্রী-জাতি লম্বায় পুরুষের চেয়ে বড়ো। একবার একটি 4 মিটারের মতো লম্বা পাওয়া গিয়েছিল। সমুদ্রের খাড়ির মুখে নদীতে আর এক প্রজাতির ছোটো জাতের 'কালো শুশুক' (নিউমেরিস ফোকাইনোয়িডেস), ইং. লিটল ইণ্ডিয়ান প্যরপাস, ব্লাক ফিনলেস প্যরপাস দেখা যায়। লম্বায় 120 সেমি।

শুশুকের দেহ সরু থেকে মোটা হয়ে আবার সরু। লম্বাটে মাথা থেকে সরু চঞ্চুর মতন লম্বা ঠোঁট। চোয়ালে উপর নিচের দুই পাটিতে 27 থেকে 32টি করে প্রতি সারিতে দাঁত। শিশুকালে উপরের চেয়ে নিচের পাটিতে দাঁতের সংখ্যা বেশি। দাঁত তিনকোণা এবং সুঁচলো। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দাঁতগুলো ভোঁতা হয়ে যায় এবং খাড়া খাড়া হাড়ের মতো হয়। খাঁটি সমুদ্র শুশুক (ডেলফিনাস ডেলফিস) যেমন ঘাড়হীন, এই গণের (প্লাটানিসটা) শুশুকদের কিন্তু একটু ছোটো ঘাড় আছে। বুকের পাখনা চ্যাপ্টা, আকারে ত্রিকোণা এবং মাপে ঠোঁট বাদ দিয়ে দেহের এক-ষষ্ঠাংশ। নিঃশ্বাস ছাড়ার গর্তটা দ্রাঘিমাগত সরু চেরা। চোখ আকারে মোটর দানার মতো এবং মণিহীন। সে কারণে এদের বলা হয় 'গঙ্গার অন্ধ শুশুক'। দেহের রঙ গাঢ় সীসে-ধূসর থেকে সীসে-কালো। নিচের অংশ কিছুটা ফিকে। বয়স্কদের দুপাশের রঙ হাল্কা ছোপ ছোপ।

বাসস্থান—গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু নদনদীতে এবং তার শাখা-প্রশাখায়। সমুদ্রের খাড়ির মুখে দেখা গেলেও কখনও সমুদ্রের ভিতর ঢোকে না।

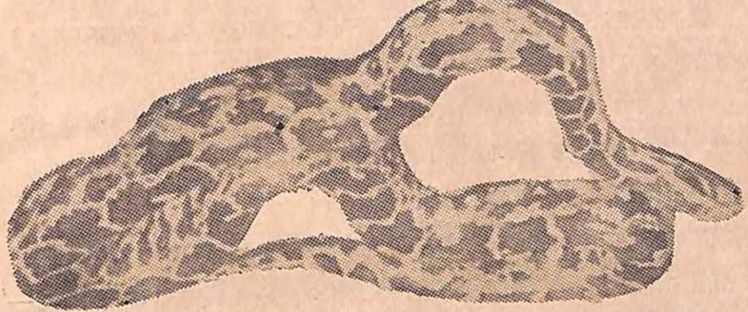
নদীর কোনো কোনো অংশে ছোটো দলে দেখা গেলেও এরা সাধারণত সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করে না। গরমকালে নদীর যেসব অংশে এদের আগে দেখা গিয়েছিল সেখানে পরে আর দেখা যায় না। মনে হয় এই সময় তারা পরিযায়ী বৃত্তি নেয়। কিংবা খাদ্যাভাব, জলে উষ্ণতাবৃদ্ধি অথবা কিছু নদীতে জোয়ার-ভাটায় লবণাধিক্যও কারণ হতে পারে। আর অন্য কিছু কারণ হতে পারে কিনা তা

এখনও জানা যায় নি। আনুভূমিক চ্যাপ্টা লেজ উপর নিচ করে, কখনও জাহাজের চাকার মতো ঘুরিয়ে সাঁতার কেটে চলে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নিঃশ্বাস নিতে জলের উপর উঠে ডিগবাজি খেয়ে জলের নিচে চলে যায় কয়েক মিনিটের জন্যে।

শুশুকের চোয়াল এমনভাবে তৈরি যে জলের তলায় থাকা গেঁড়ি-গুগলি ইত্যাদি কবচী ও শুঁড়ওয়ালা ট্যাংরা, শিঙি, আড় ইত্যাদি মাছ (ক্যাটফিশ) চিবিয়ে খেয়ে থাকে। ঘোলা জলে বাস করার জন্যে চোখের ব্যবহার একদম হয় না। চোখ থাকলেও দেখে না। বর্ষার সময় এরা নেমে যায় একেবারে জোয়ার-ভাটা যেখানে বেশি সেখানে, একদম প্রায় খাড়ির মুখে। তার ফলে জেলেদের জালে মাঝে মাঝে ধরা পড়ে। এই সময় দেখা যায় জলের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে।

প্রজননকালীন আচার-ব্যবহার এখনও সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় নি। লক্ষ্য করা গেছে 8-9 মাস গর্ভধারণ করে এক বা দুটি শাবকের জন্ম দেয় এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মধ্যে।

ভারতের কোনো কোনো স্থানে মাংসের জন্য এদের মারা হয়। চর্বি থেকে যে তেল তৈরি হয় তা দিয়ে বাতি জ্বালানো হয়। এই তেল পিঠ ও কোমরের বাতে মালিশ করলে নিরাময় হয় বলে লোকের বিশ্বাস।



অজগর

অজগরকে মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় প্রথম দেখি সেই 1926 সালে রামগড় থেকে হাজারিবাগের পথে। যাচ্ছিলাম টি-মডেল ফোর্ড গাড়ি করে। বনেজঙ্গলে খানাখন্দ নালা ইত্যাদি পার হবার একমাত্র যান ছিল তখন এই ফোর্ড। বর্তমানে জীপ তার স্থান নিয়েছে।

পাহাড়কে বেড় দিয়ে রাস্তা উঠে গেছে। হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে দেখি পীচ বাঁধানো চওড়া রাস্তা প্রায় জুড়ে পাশের খাদের দিকে একটা মোটসোটা অজগর নেমে যাচ্ছে। প্রবীণ চালক গাড়ি থামিয়ে দিলেন। তেল চকচকে গায়ে চাকা চাকা গাঢ় পাটকিলের দাগ, একটু হলুদের ভাব আছে। বর্শার ফলকের মতো মুখ, লেজ ছোটো। গাড়ির ভিতরে বড়োদের মধ্যে কেউ বললেন, এর উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে। কেউ বললেন, গুলি করে মারতে। চালকের পাশেই গুলিভরা দোনলা বন্দুক। তিনি বললেন, না ওতো কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করছে না। কি সুন্দর দেখতে, শুধু শুধু মারব কেন? এই শুনে অনেকেই ক্ষুব্ধ। সাপকে মেরে ফেলাই উচিত। অত বড়ো সাপ যদি আক্রমণ করে? আমি সন্তর্পণে বললাম, অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে। ওরা তো তেড়েই আসে। জবাব পেলাম, হাসিখুশির ওই লেখা সম্পূর্ণ ভুল। সাপ

সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। অজগর কখনই তেড়ে আসে না। ওদের সম্বন্ধে বহু মিথ্যে গল্প লোকে বলে থাকে।

এই আমার সর্বপ্রথম একজন প্রকৃত প্রকৃতি প্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ। অথচ উনি খুব ভালো শিকারী ছিলেন।

পরে অবশ্য অজগর জঙ্গলে দেখেছি। সাপুড়ে বা অন্য কারুর পোষা সাপ হাতে, কাঁধে ও গলাতে ঝুলিয়েছি। তারা কেউই পেঁচিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে নি। কারণ, অজগর সহজেই পোষ মানে।

নির্বিষ মহোরণ বংশে (বয়েদি) দুটি উপবংশ, মহাকাল (পাইথনিনি) ও বোয়া (বয়েনি)। মহাকাল উপবংশে ময়াল গণের (পাইথন) এক প্রজাতি— অজগর বা ময়াল (পাইথন মলুরাস), ইং· ইণ্ডিয়ান রক পাইথন। দৈর্ঘ্য 3 থেকে 6 মিটার, জন্মায় 50 সেমি। অপর প্রজাতি—চিত্রিত ময়াল (রিগাল রেটিকুলেটাস) ইং রিগাল পাইথন। দৈর্ঘ্য 10 মিটারের বেশি।

বাসস্থান—ভারতে প্রায় সর্বত্রই অজগরকে দেখা যায়। পশ্চিমঘাট ও আসামের পাহাড়ী জঙ্গলের অজগরের দেহের রং মধ্যভারত ও পূর্ব উপকূলের অপেক্ষা অনেক গাঢ়। তলার রং সাদাটে, হলদেটে বা কারুর হালকা কমলা রঙের হয়। পায়ুর গর্তের দুপাশে দুটো সরু কাঁটার মতো থাকে যা আদিমযুগের সরীসৃপের পা-কে চিহ্নরূপে বহন করছে। পুরুষের পায়ের চিহ্নটা একটু বড়ো হয়। নাকের দুপাশে লম্বালম্বি চেরা গর্ত যা তাপ সংজ্ঞাবহের কাজ করে। বিষাক্ত গেছো বোড়া জাতীয় (পিট ভাইপার) সাপেদের এমন গর্ত থাকে।

সমুদ্রের খাঁড়ির মুখে সুঁদরী গরান ইত্যাদির (ম্যানগ্রোভ) ঘন জঙ্গল, পাহাড়ী অঞ্চল এবং দু'হাজার মিটার উচ্চতার ভিতরে বর্ষণমুখর ঘন জঙ্গলে এদের আবাস। যে কোনো পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মানিয়ে নিতে পারলেও যেখানে মানুষের উপদ্রব কম সেই স্থানের কন্দর বা গুহায় অন্যান্য বন্যপ্রাণীর তৈরি গর্তে, গাছের ফাঁপা ফোকরে, ঘন নলখাগরা এবং গরানের জঙ্গলে বাস করতে বেশি পছন্দ করে। সাধারণত এই ধরনের বাসস্থানের কাছে জল থাকা আবশ্যিক।

খাদ্য—গরম রক্তের জীব, ইঁদুর পাখি থেকে শিয়াল ইত্যাদি, এমনকি হরিণ ও বন্য বরাহ। নিঃশব্দে চুপিসাড়ে হঠাৎ আঘাত হেনে শিকারকে মরণ প্যাঁচে পেঁচিয়ে ধরে। চেপে কখনও হাড়গোড় পিষে ফেলে না, শুধু নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস

ও হৃদপিণ্ডের কাজ বন্ধ করে দেয়। ভারতে কোনো মানুষকে গিলে খেয়েছে তার সঠিক প্রমাণ এখনও মেলে নি।

স্বভাব—দিনের বেলায় অজগর রোদের মধ্যে হয় ঘুমায়, না হয় রোদ পোহায়। শিকার করে রাতে। সাধারণত পশুদের জল পান করার স্থানে বা তাদের যাবার পথে নিঃশব্দে অপেক্ষা করে। ভুরিভোজনের পর নড়াচড়া করে না বেশ কিছুদিন। দেখা গেছে খাদ্যবস্তু হজমের জন্য কয়েক সপ্তাহ পার করে দিতে।

প্রজননকাল মার্চ থেকে জুন। ডিম পাড়ে একশ পর্যন্ত। সমস্ত শরীর দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ডিমে তা দেয় 60 থেকে 80 দিন।

বর্তমানে ভারতের বহুস্থানে অজগর লুপ্ত হয়ে গেছে ও যাচ্ছে তার সুন্দর চামড়ার জন্য। কিছুদিন আগে কলকাতায় যে অজগর প্রাপ্তির সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে আমার মনে হয় উত্তরবঙ্গ থেকে কাঠবওয়া লরিতে তারা এসেছিল কোনো সুযোগে।



শিয়র চাঁদা

শোনা যায়, শিয়র চাঁদা সাপ মানুষের শরীরের লোনা ঘাম খায়। প্রবাদে বিশ্বাস আর বৈজ্ঞানিক সত্য দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। যতদিন না প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে ঘুমন্ত মানুষের ঘাম এই সাপ খায় ততদিন প্রচলিত কোনো প্রবাদকেই বিশ্বাস করা যায় না। তবে শিয়র চাঁদা বিছানায় ওঠে এবং নিশাচর বলে মানুষের ঘরে আসে এটা ঠিকই। বিছানায় ওঠে বলেই পেটের কাছে অর্থাৎ নাড়ির উপরে কোনো স্থানে দংশন সম্ভব এবং সেটাই সাধারণত ঘটে থাকে। কিন্তু অন্য জায়গায় যে একেবারেই কামড়ায় না এমন নয়। বিহারের ছোট নাগপুর অঞ্চলে এই সাপ এক সময় প্রচুর দেখেছি। এমনকি বিছানাতেও। কিছু আধা জংলী জায়গায় বাস করার সময় প্রতি রাতে শুতে যাবার আগে ভালো করে বিছানাটাকে দেখতে হতো। সেই সময় নিজের বিছানায় পেয়েছি দু'একটিকে এবং মারতেও হয়েছে।

আমার এক হকি খেলোয়াড় বন্ধুকে গিরিডির বেনিয়াডি কোলিয়ারিতে কামড়েছিল পায়ে, শেষ রাতে পা দিয়ে পায়ের কাছে পড়ে থাকা সুজনি গায়ে দিতে গিয়ে। সে বলেছিল, কে যেন দুটো জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির ছ্যাঁকা পায়ের গুলিতে দিল। বেঁচে যায় অনেক চিকিৎসার পর। নেশার ঘোরের মতন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ছিল বেশ কিছুদিন। নাকের ডগা থেকে পায়ের ডগা পর্যন্ত সমস্ত মাংসপেশী সর্বক্ষণ থিরথির করে কাঁপতে দেখেছি। সর্পবিদ দীপক মিত্রকেও কামড়ে ছিল। তাঁর অভিজ্ঞতা, কামড়ে যন্ত্রণা বড়ো একটা হয় না। হাত-পা কুঁকড়ে আসতে চায়, মাঝে মাঝে হঠাৎ হাড়ের ভিতরটা যেন

কনকনিয়ে ওঠে আর জায়গাটা রি রি করে জ্বলতে থাকে। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। চোখের পাতা বুজে আসতে চায়। মনে হয় মাথা সমেত ঘাড়টা যেন গর্তের মধ্যে চলে যাচ্ছে।

প্রচলিত নাম— কালাজ বা কালাচ। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। কেবল আসাম ও ওড়িশায় কিছু কম। কিন্তু চব্বিশ পরগনায় বলে শিয়র চাঁদা বা শিকড় চাঁদা, নদীয়া জেলায় কাঁদোড় এবং ওখানকার সাপুড়িয়ারা বলে শাঁখাপাটি, বর্ধমান বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় ডোমনাচিতি, হিন্দিতে করাইত, ইং. কমন ক্রেইট (বুনগারাস কাএরুলিউস)।

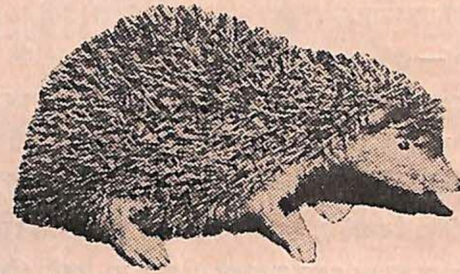
মারাত্মক বিষাক্ত সাপের মধ্যে অন্যতম কালাজ বা শিয়র চাঁদা লম্বায় 5 ফুট পর্যন্ত হয়। পূর্ণ বয়স্কের শরীরের বেড় সর্বাধিক 4 ইঞ্চি। কালচে নীলাভ দেহের উপর পিঠের দিকে সরু সরু সাদা ডোরা কাটা। সামান্য চ্যাপ্টা ছোটো মাথা, কালো চোখ কোটরের ভিতরে। দেহের নিচের রঙ সাদা।

খাদ্য—ছোটো ছোটো সরু সাপ, ছোটো ইঁদুর, ব্যাঙ ও গিরগিটি। পাখি খেতে দেখা যায় না। মাথা ছোটো বলেই তা সম্ভব নয়, কারণ মুখ বেশি খুলতে পারে না।

স্বভাব—মাঠে-ঘাটে ঢিবি-ঢাবায় গাছের গোড়ায় বাস করে, ইঁদুরের গর্তে, যেখানে উপরে ছায়া, সকালে পুবের এবং বিকেলে পশ্চিমি রোদ পড়ে। মাথা খুব শক্ত তাই খুব ছোটো গর্তে জোর করে ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়ে। গর্তের মুখ সাধারণত ছোটো ঘাসে ঢাকা থাকে বলে সহজে নজরে পড়ে না। উন্মুক্ত বড়ো মুখের গর্তে খুবই কম দেখা যায়। 5 ফুট মাটির নিচেও এদের বাসা দেখা গেছে।

কালাজ স্বভাবে ক্ষিপ্র এবং গাছপালা চড়তে অভ্যস্ত। গাছের উপর চড়ে বেত আছড়ার (ব্রোঞ্জব্যাক ট্রি স্নেক, ডেনড্রেলাফিস ট্রিসটিস) মতো চঞ্চল ও দ্রুতগতিসম্পন্ন সাপকেও শিকার করে।

এদের তীব্র বিষের জন্য পুরুলিয়া জেলায় একটি প্রবাদ আছে, 'খেলেক ডোমনা তো ডাক বামনা।' অর্থাৎ ডোমনাচিতি কামড়ালে মৃত্যু অবধারিত সুতরাং শাস্ত্রীয় মতে দাহকার্যের জন্য ব্রাহ্মণ ডাকাই প্রশস্ত।



কাঁটাচুয়া

ওড়িশার বলাঙ্গিরে একটা আশ্চর্য কীটভুক (ইনসেকটিভোরা) জন্তু 'কাঁটাচুয়া' দেখেছিলাম 1978 সালে।

বড়দিনের সময় বলাঙ্গিরে কালেকটারে বাড়িতে অতিথি হয়ে আছি। একদিন এক পড়ন্ত বেলায় পাকা সড়ক ছেড়ে দক্ষিণদিকে চলেছি। পুরোনো পরিত্যক্ত রাজবাড়িকে বাঁয়ে রেখে একটু এগিয়ে বেশ বড়ো ঝোপ-আগাছার পাশে বসলাম। এমনিতেই জায়গাটা একটু নেড়া মতন। ছড়ানো-ছিটানো গাছপালা। একদিকে পাহাড় জঙ্গল নদী, অন্যদিকেও নদী, দূরে জঙ্গল। কাছেই গরুর গাড়ি যাবার পথ। পথের দুপাশেই গাছ। সেই পথে ধুলোর উপর থেকে মাঝে মাঝে দু'একটা ছেপকা (নাইটজার) উঠছে, উড়ছে পোকা খাবার জন্যে। কানে আসছে পরিত্যক্ত রাজবাড়ির ভিতর থেকে লক্ষ্মী পেঁচার (বার্ন আউল) চিল চেঁচানি আর তার দুই চঞ্চুর ঠকঠকানি। একটু বাদেই আবার শুনতে পেলাম কোটরে পেঁচা (স্পটেড আউলেট) কর্কশ গলায় ডাকছে 'চিরুরর্-চিইভাক্' করে। কোথা থেকে একটা কাল পেঁচার (ব্রাউন হক আউল) খুব মিষ্টি সুরে 'উ-উক্ উউ-উক্' ডাকও কানে এল। মনে মনে ভাবছি এযে পেঁচার রাজত্বে এসে পড়েছি।

অন্ধকার নেমে এসেছে। নক্ষত্রের আলোয় দেখি সামনের ডানদিকের ঝোপের তলা থেকে উলটানো বাটির আকারের ঘাসের চাপড়া বেরিয়ে গুটিগুটি আমার দিকে আসছে। হাত পাঁচেকের মধ্যে আসতে বুঝলাম ভয় পাবার মতো কোনো জন্তু নয়। টর্চের আলো ফেলতেই নিমেষের মধ্যে মাথা-মুখ গুঁজে নিজেকে একটা খোঁচা খোঁচা কাঁটার বলে পরিণত করে ফেলল। আলো নেবাতে বেশ খানিক পর নিজের দেহকে সোজা করে লাফাতে লাফাতে ঝোপের তলায় চলে গেল। দক্ষিণ ভারতের জঙ্গলে ও পোষ্য রূপে খুব কাছ থেকে এদের দেখেছি।

এই কাঁটাচুয়া (পারাএকিনাস মাইক্রপাস), ইং. হেজহগ, লম্বায় দেহ-মাথা 15-18 সেমি, লেজ 2·5 সেমি।

শুয়োরের মতো তুন্ড বলে ইংরেজি হগ নামটা এসেছে। চোখ-কান দুইই সুগঠিত। দেহ ছোটো হলেও গাঁট্টাগোট্টা। লেজ খুবই ছোটো। চারটি পা-ই খুব ছোটো এবং নখরযুক্ত। এই নখর মাটি খোঁড়ার খুবই উপযুক্ত। একমাত্র তলার দিক ছাড়া পিঠ ও দেহের দুপাশ সাদাটে এবং হলদেটে পাটকিলে কাঁটায় ভর্তি। মাংসপেশী যখন টান করে না তখন কাঁটা গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে। নিজেকে কাঁটার বলে পরিণত করতে পারার জন্যে শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার পায় সহজেই। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের জঙ্গলে দেখেছি শেয়ালের সঙ্গে বুঝিতে পারে না। তারা কাঁটার বলকে পা দিয়ে সন্তর্পণে ঠেলতে ঠেলতে কোনো জলভরা গর্তে নিয়ে ফেলে, আর গায়ে জল লাগার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁটাচুয়া দেহটা খুলে ফেলতে বাধ্য হয়, তখন শেয়ালের উল্টে ফেলে মারতে অসুবিধে হয় না।

ভারতে অপর এক প্রজাতির কাঁটাচুয়াকেও (হেমিএকেনাস অরিটাস কললারিস) দেখা যায়। তাদের কানটা একটু বড়ো বলে ইংরেজি নাম, 'লংগইয়ার্ড হেজহগ'। বাসস্থান—কচ্ছ, সিন্ধু, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও আশপাশের খরা বা মরু প্রধান অঞ্চলে। আমি যাদের কথা বলছি (পেল হেজহগ) তাদের বাসস্থান—মধ্যভারত থেকে দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র। এদের কপাল থেকে মাথা পর্যন্ত একটা কাঁটাহীন সরু লাইন, দেখায় যেন সিঁথিকাটা। গায়ের রঙ উত্তর ভারতের মতো গাঢ় পাটকিলে নয়, অনেক হালকা।

প্রধান খাদ্য—পোকামাকড়, ধেড়ে ও নেংটি ইঁদুর এবং পাখির ডিম। মাঝে মাঝে ফল মূলও খেয়ে থাকে।

স্বভাব—কাঁটাচুয়া নিশাচর। সন্ধ্যে হলেই হয় গর্ত না হয় ঝোপ বা ঘাসের চাপড়ার ভিতর থেকে খাদ্যান্বেষণে বেরিয়ে আসে এবং ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের আস্তানায় ফিরে যায়।

দক্ষিণ ভারতে একজনকে পুষতে দেখেছিলাম। তাকে হাতের উপর তুলতেই পিঠটাকে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে এমন জোরে ফুলিয়ে তুলল যে আমার হাতে কয়েকটা কাঁটা ফুটে গেল। আর মুখ দিয়ে রীতিমতো প্রতিবাদ জানালো হিসহিস্‌ ও ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে। তাকে দুধ, পাউরুটি, টিকটিকি ও মাংসের কিমা খাওয়ানো হতো। সেই ভদ্রলোকের কাছে শুনেছি ওখানকার আদিবাসীরা কাঁটাচুয়ার গায়ে মোটা করে কাদা লেপে দেহ-গোটানো বলটাকে রোদে শুকিয়ে কাদাটা শক্ত করে। তারপর বলটা ভাঙলে কাঁটা ও উপরের ছাল আপনা থেকেই উঠে আসে। মাংস মুরগীর মতো সাদা, খেতেও নাকি সুস্বাদু।

ইংল্যান্ডে কাঁটাচুয়া পোষার একটা রেওয়াজ আছে। ওখানকার কাঁটাচুয়ারা শীতঘুম দেয়। আমাদের দেয় কিনা জানা যায় না। সিন্ধু ও উত্তর ভারতে প্রচণ্ড শীতের সময় এদের দেখা যায় না।

প্রজননকাল ও রীতি সম্বন্ধেও সঠিক তথ্য পাই না। সাধারণত মে-জুন মাসে 3 থেকে 8টি অন্ধ সন্তান দেখা যায়। সেই সময় পিঠের কাঁটা খুবই ছোটো 2 মিমি আর তলতলে নরম। চতুর্থ সপ্তাহে মার পিছন পিছন ঘোরে এবং এক বছর বয়েসের ভিতরেই পূর্ণরূপ পায়। বন্দীদশায় প্রায় দশ বছর বাঁচতে দেখা গেছে।



নাসিকাপদ

বর্তমান যুগে মানুষ নব নব দিকে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা চালিয়ে অভুতপূর্ব সাফল্য লাভ করলেও, এখনও অনেক কিছু আছে যা আমরা জানি না। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের একটি দ্বীপে স্তন্যপায়ীর এমন একটি প্রজাতির সন্ধান স্পাৎজস্টাডট্ ইউনিভার্সিটির তুলনামূলক জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ আলেকজাণ্ডার কারানৌস্কি যা জানিয়েছেন তা বিশ্ববাসীর কল্পনার বাইরে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে মেলানেসিয়ার দ্বীপপুঞ্জগুলি ধনুকাকারে জোট বেঁধে আছে উত্তর-পশ্চিম পাপুয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্বের ফিজি পর্যন্ত। এর মধ্যে আছে শত সহস্র ছোটো ছোটো দ্বীপ। তার মধ্যে এমন কতকগুলো আছে যে একটা ছোটো অ্যাটলের চেয়ে বড়ো নয়। অ্যাটল হল প্রবাল সমুদ্রের ভিতর খুব ছোটো প্রবাল দ্বীপ যা একটা উপহ্রদকে ঘিরে থাকে। সব সময় উপহ্রদকেই যে ঘিরে থাকবে তা কিন্তু নয়। বিচ্ছিন্নভাবেও থাকতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলের প্রতি সভ্যজগতের বিশেষত ইউরোপ আমেরিকাবাসীদের একটা দুর্দমনীয় আকর্ষণ আছে। কারণ, সমুদ্রধারের বেলাভূমি নীল উপহ্রদ, গাঢ় সবুজ গাছপালা এবং অজানা উদ্ভিদজীবন তাঁদের হাতছানি দেয়।

মেলানেসিয়া দ্বীপপুঞ্জের বৈচিত্র্যময় রঙ বিস্ময়ে বিহ্বল করার মতন। কত রকমের যে রঙিন মাছ যা আর কোথাও দেখা যায় না এবং অগণিত পাখির দল তাদের পালকের অবর্ণনীয় রঙের ছটা উড়িয়ে গাছপালার মধ্যে এ-ডাল সে-ডাল এ-গাছ সে-গাছ করে, আর কত রঙের যে ফুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফুটে আছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। রূপকথার স্বপ্নপুরীর মতো দ্বীপগুলির সকল রহস্য বিজ্ঞানীদের কাছে আজ আর অজানা নেই। তবু কিছু এখনও মানুষের জ্ঞান বা যুক্তির অতীত রহস্যময় বস্তু হয়ে আছে যার ব্যাখ্যা আজও আমরা দিতে পারি না। এমনই সেখানকার পরিবেশ।

1963 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডঃ কারানৌস্কির বন্ধু ও সতীর্থ ডঃ জোনাস ফিশ এই অঞ্চলের সলোমন দ্বীপপুঞ্জের চারধারে হাঙ্গরদের গতিবিধি গবেষণার জন্য হাজির হন। তাঁর কাজকর্ম বেশ চলছিল। হঠাৎ একদিনের দমকা ঝড়ে তাঁর ছোটো নৌকাটিকে গন্তব্য পথ থেকে বহুদূরে নিয়ে ফেলে। ঝড় থামলে তিনি দেখেন তিনি এসে পৌঁছেছেন একটা ছোটো প্রবালের অ্যাটলে। নাম রারাডা, স্থানীয় লোকেদের কাছে যার অর্থ, 'যেখানে হাঙ্গরেরা তাদের লেজের ঝাপট মারে।' তাই তিনি ঠিক করলেন এখানেই অনুসন্ধান চালাবেন।

রারাডা এমন একটা ছোটো দ্বীপ যে তার কাছ দিয়ে মেলানেসীয় কোনো বাণিজ্য জাহাজের যাতায়াত নেই। আর নামেই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে যে এর চারপাশের জল হাঙ্গরে ভর্তি। তাঁর আগে এখানে কোনো সভ্য-মানুষের পদার্পণ ঘটে নি।

ডঃ ফিশ রারাডার বেলাভূমিতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই আকৃষ্ট হলেন কতকগুলো ছোটো ইঁদুরের মতো প্রাণী দেখে। তাঁকে কাছে আসতে দেখে প্রাণীগুলো নাকের উপর ভর দিয়ে দেহটাকে সোজা উপর দিকে খাড়া করে তাদের লেজগুলো সবেগে নাড়তে লাগল। নাক মাটিতে সরাসরি লেগে আছে লাল নরম রাবারের মতো প্যাডের সাহায্যে। লেজ কিন্তু কুকুরের মতো আনন্দে ঘনঘন নাড়াচ্ছে না। লেজের শেষে ধারালো নখর এবং লেজের বাড়িতে বেশ যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করে। সেটা তিনি বেশ ভালো করে বুঝলেন খালি হাতে ধরতে গিয়ে।

তিনি লক্ষ্য করলেন, এই অজ্ঞাত অভূতপূর্ব জীবগুলি পোকামাকড়দের আকর্ষণ করে লেজ থেকে এক আঠালো মিষ্টি তরল পদার্থ বার ক'রে।

পোকারা এসে মিষ্টি আঠালো লেজের উপর বসলেই আটকে যায়। সামনের লম্বা দুই হাত দিয়ে সেই পোকাকে ধরে মুখের কাছে এনে কচমচ করে চিবিয়ে খায়। তলপেটের নিচে যে দুটো পা আছে তা খুবই ছোটো। ডঃ ফিশ তাঁর নোটবুকে স্কেচ করে এই প্রজাতির নাম দিলেন 'ডালিককউডা গ্রিসেঅরেল্লা'।

বিজ্ঞানের কাছে অজানা এক প্রজাতি আবিষ্কার করে প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, শুধু একটি মাত্র প্রজাতি নাক দিয়ে হাঁটে না, আরও কিছু এই ধরনের প্রজাতি আছে। উত্তেজিত তিনি নিশ্চয়ই হয়েছিলেন, কিন্তু একজন নিছক বিজ্ঞানী হওয়াতে, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রত্যেকটির যাদের তিনি দেখলেন তাদের সম্বন্ধে তদন্ত চালিয়ে গেলেন।

বংশের নাম দিলেন 'নাসিকাপদ' (নাসাপডস্)। লক্ষ্য করলেন, এইসব স্তন্যপায়ীদের নাক বিশাল এবং অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে এরা অবস্থার উপযোগী নাকরূপ প্রত্যঙ্গলাভ করেছে। কেউ নাকের ব্যবহার করে চলার জন্যে, হয় দৌড়ে না হয় লাফিয়ে। আবার কেউ খাদ্যসংগ্রহের জন্যে ব্যবহার করে।

নাসিকাপদদের মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক হল—এলেডোনোপিস স্যুয়াভিস। এই প্রাণীটি গাছের গোড়ায় গর্ত ক'রে তার মধ্যে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থেকে লম্বা লম্বা গোটা ছয়েক নাক বার ক'রে সামনে সাপের মতন ছাড়িয়ে দেয়। প্রতিটি নাক চ্যাপ্টা, খাঁজকাটা আর তাতে চকচকে তরল পদার্থের স্রোত একদিক দিয়ে আসছে অন্য দিক দিয়ে ফিরে যাচ্ছে, তাতে পোকামাকড় পড়লে ভেসে চলে যাচ্ছে নাকের ভিতর দিয়ে মুখে। যেন এক-একটা কনভেয়ার বেল্ট।

এক জাতের নাসিকাপদ—নাসোবেমা লাইরিকাম, তার চারটে নাক। সেই নাকের উপর দিয়ে এরা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদের জঙ্গলে দৌড়ে বেড়ায়। এরা লতাপাতা ভোজী। নরম ফল প্রধান খাদ্য। ল্যাসোর মতো লেজ ছুঁড়ে সেই ফল গাছ থেকে ছিঁড়ে আনে। পিছনের পা দুটি ছোটো। এটা প্রায় সব নাসিকাপদেরই।

ডঃ জোনাস আবার কতকগুলি অদ্ভুত অভূতপূর্ব নাক দেখলেন। তার মধ্যে একটি তাঁকে অভিভূত করে খুব বেশি। সেই নাকের অধিকারীর নাম— রানুনক্যুলোনাস পুলেচর। এই প্রাণীটির ছটি নাক। প্রত্যেকটি নাকই শেষ হয় ফুলের পাপড়ির ডগার আকারে। এই ডগার সঙ্গে ওখানকার ফুলের

এমন সাদৃশ্য যে সহজে তফাত ধরা যায় না। সাদৃশ্যই এদের সুবিধে করে দেয় ছোটোখাটো পোকামাকড়দের ভোলাতে। পোকামাকড়ই এদের প্রধান খাদ্য।

ডঃ ফিশ খুব অল্প কথায় স্কেচসহ তাঁর স্থানীয় গাইড ডোরাউইউইকে দিয়ে এই সব খবর পাঠান ডঃ কারানৌস্কির কাছে। এর কয়েক সপ্তাহ পরে হঠাৎ আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণে রারাডাসহ ডঃ ফিশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যান। সেই সঙ্গে সবচেয়ে দুঃখজনক সংবাদ বিজ্ঞানের কাছে নাসিকাপদদের হারিয়ে যাওয়া। যদি না কয়েক সপ্তাহ আগে ডাঃ ফিশ ডোরাউইউইকে দিয়ে নাসিকাপদ-সংবাদ সভ্যজগতে পাঠাতেন তবে মানুষ এখনও পর্যন্ত এই ধরনের বিচিত্র প্রাণী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতো না। অন্ধকারের গহ্বরেই থাকত।

আরও বিশদ ব্যাখ্যার অভাবে, যা আর কখনও পাব কিনা সন্দেহ, এদের সম্বন্ধে যথাযথ ভাবে কিছু বলা অসম্ভব। কবে কিভাবে নাসিকাপদরা পৃথিবীর বুকে এসেছে এবং কোন্ স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে এদের আত্মীয়তা। কিন্তু আমরা একটি বিষয়ে নিশ্চিত যে এইভাবে কোনো প্রাণীর আবির্ভাব নিছক একটা ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। নাসিকাপদদের জীবিত থাকা এখন অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে, কারণ তাদের সঙ্গে বাস করে এমন কোনো শিকারজীবীদের খবর ডঃ ফিশ দেন নি। শিকারীদের সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করে টিকে থাকাটাই ছিল পরীক্ষা। সেই পরীক্ষার সম্মুখীন তারা হয়েছিল কিনা তা জানা যায় নি। ডঃ ফিশও উল্লেখ করেন নি। তবে তাদের অস্তিত্বের এই খবরে একটা জিনিসই সূচনা করে যে পৃথিবীর কোনো সুদূর অজ্ঞাত কোণে এমনও এখন কোনো জীবিত প্রাণী থাকতে পারে যাদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।